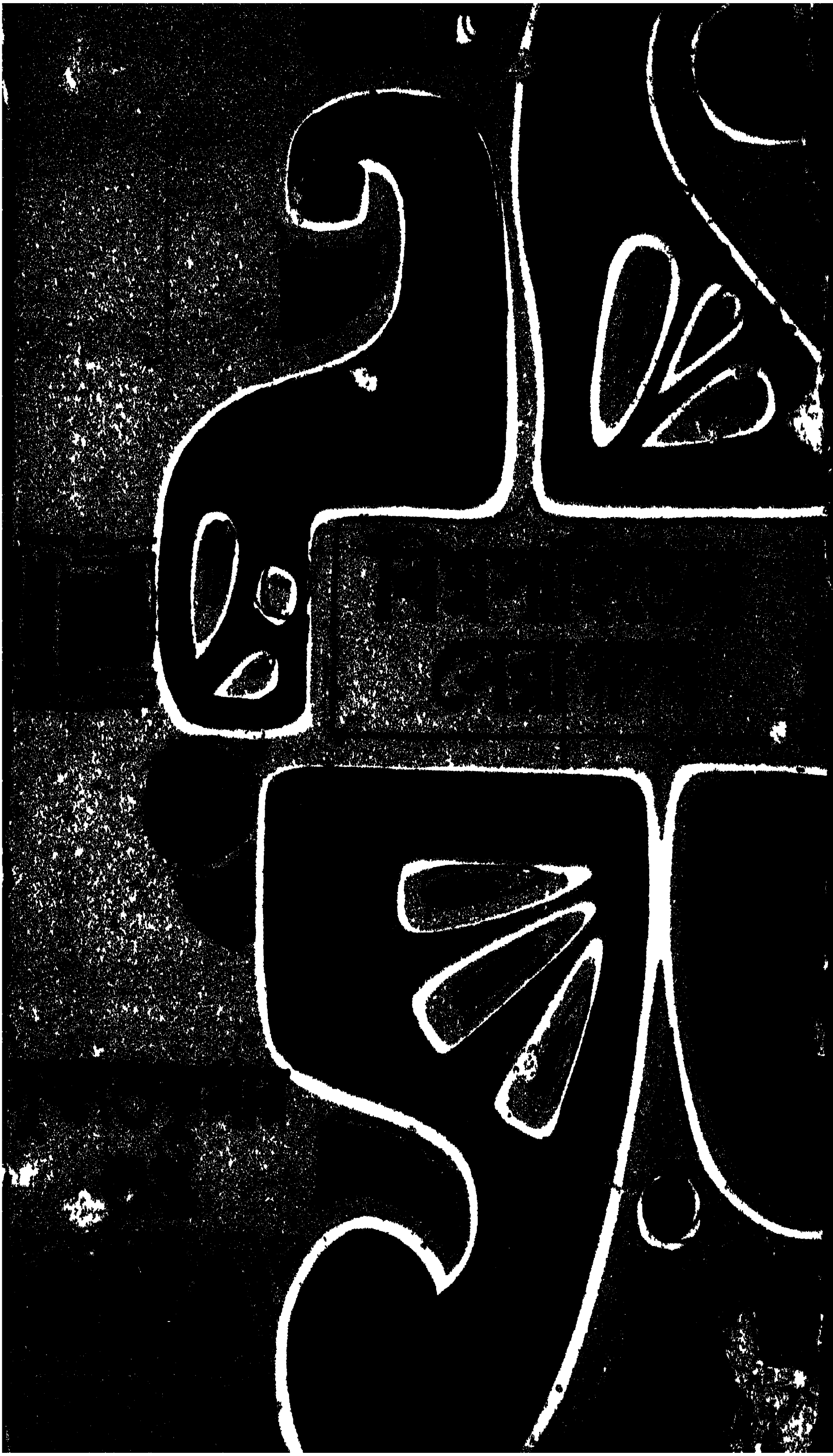


বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
এস, ঘোষ
সাহিত্যলোক
৩২।৭, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রক :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭।এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬

অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে জাতীয় অধ্যাপক আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত :

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার গুপ্ত এম-এ কর্তৃক অনূদিত কতকগুলি ইউরোপীয় ছোটগল্পের সংগ্রহ আমি দেখিয়াছি। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু এবং কতকগুলি শ্রেষ্ঠ আধুনিক গ্রন্থকারের সহিত একটু পরিচয় ঘটাইয়া দিবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা তিনি বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য করিয়াছেন তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তাঁহার ভাষা সাবলীল, ঝরঝরে, পড়িয়া যাইতে কোথাও বাধে না, ভাবগ্রহণে কোনও অসুবিধা হয় না। অনুবাদকের পক্ষে ইহা একটা বড় কথা। আশা করি বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক একটী ধারার সঙ্গে ইহার বইখানি বাঙ্গালী পাঠকগণকে পরিচিত হইতে সাহায্য করিবে।”

এই লেখক সম্বন্ধে ‘প্রবাসী’র অভিমত :

বাংলা ভাষার মারফৎ আজকাল যে কয়জন লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন ও রসবৈচিত্র্য বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট পরিবেশনের ভার লইয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে পড়েন। তাঁহার ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, প্রকাশভঙ্গী অকুণ্ঠ ও বেগবান, মূল গল্পের ভাবধারা ও রসপরিবেশনের সম্পূর্ণ উপযোগী। প্রত্যেক গল্পের মুখবন্ধে লেখক ও তাঁহাদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় গল্পগুলি পড়িবার জন্য পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে। গ্রন্থকারের নিকট নিবেদন, তিনি যেন বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে এইরূপ আরও বহু গল্প অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫২

ভূমিকা

ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প বাংলায় অনুবাদিত হইয়া এই সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার গুপ্ত এম এ। আমি এই অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ ও সুরল, ইহার গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। কোথায়ও সচেষ্টতা বা আড়ষ্টভাবের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। প্রত্যেক লেখকের সুর ও মনোভাবের বৈশিষ্ট্য, বর্ণনা ও মন্তব্যের নিজস্ব ভঙ্গীটী ভাষান্তরের ভিতর দিয়া চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা অনুবাদকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে। • এই গ্রন্থের সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকগণ ভাষার অপরিচয়, রীতি-নীতির পার্থক্য ও জীবনের গতিচ্ছন্দের বৈষম্য অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন ও রসবৈচিত্র্যটী অনুভব করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় গল্পসাহিত্যের অনুবাদপ্রচেষ্টা কিছুদিন ধরিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই অনুবাদের ভিতর দিয়া বৈদেশিক গল্পের প্রতিবেশকে রূপান্তরিত করিবার একটা প্রয়াস লক্ষিত হয়। ফরাসী, ইটালী বা রুষ দেশের সমাজ-পরিমণ্ডলকে নিশ্চিহ্নভাবে বাঙ্গালার সমাজ-চিত্রের সহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা অনেক স্থলেই সার্থক হয় নাই। বিদেশী জীবনযাত্রার সমস্যা ও বিশিষ্ট সুরটী আমাদের সমাজে ঠিক স্বাভাবিক ও শোভন হইয়া দেখা দেয় না। এই বৃথা চেষ্টায় লেখককে অনেক সময় কল্পনাবিলাসের আশ্রয় লইতে হয়—সুতরাং সমস্ত চিত্রটী কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে ও মূল গল্পের রসগ্রহণে অসুবিধা হয়।

বর্ত্তমান লেখক যে এই দুশ্চেষ্টা পরিহার করিয়া সরলভাবে অনুবাদকের গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, নাম-ধাম ও উদ্দেশ্যের উপর দেশী রং ফলাইয়া মৌলিক লেখকের মিথ্যা খ্যাতির প্রতি লোলুপতা দেখান নাই, ইহা তাঁহার ও গল্পগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ উভয়ের পক্ষেই শুভ হইয়াছে। আজকাল আমরা আন্তর্জাতিকতার পথে এতখানি অগ্রসর হইয়াছি যে আমাদের সাহিত্যে এই ছদ্মবেশ ধারণের কোন প্রয়োজন নাই—বাঙ্গালা ভাষা সোজাসুজি বৈদেশিক সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যরসটী আহরণ করিবার যোগত্যা অর্জ্জন করিয়াছে। বিদেশী ফুলে এখন বঙ্গসরস্বতীর অর্চ্চনা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান গল্পসংগ্রহে 'এক রাত্রির প্রেম' নামক গল্পটীর অভিজ্ঞতা কোনোমতেই সুষ্ঠুভাবে বাংলার সমাজ-প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করা যায় না। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রেমিকের মনে যে দুঃসহ বিকার ও অশান্ত, ব্যাকুল চিত্ত-বিক্ষেপের উদ্ভব হইয়াছে তাহার আবেদন সার্ব্বভৌম। বাংলা ভাষায় অনুবাদে যে ইহাব তীব্রতা ও রসমাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে ইহাই অনুবাদকের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অনুবাদ-বিভাগে বাংলা সাহিত্যের রিক্ততা ও দারিদ্র্য সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বর্ত্তমান গল্পসংগ্রহ এই ত্রুটি সংশোধনের পক্ষে একটী প্রশংসনীয় উদ্যম। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে এই পুস্তকটী বাঙ্গালী পাঠকের রসবোধের সমর্থন লাভ করিয়া সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিবে।

৩১ নং সাদার্ন এভিনিউ,
বালিগঞ্জ।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ., বি. এল., পি-এইচ. ডি.

সূচীপত্র

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অনুবাদ-গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিচিত্রা, প্রবাসী, পরিচয়, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুধারা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

আতঙ্ক

দিব্যদৃষ্টি

পাতালপুরীর আংটি

সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প

সেরা সেরা গল্প

ছুটির ঘণ্টা

মণিকাঞ্চন

সন্ধ্যা

এ গল্পের রচয়িতা হেক্টর হিউ মুনরো। সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি সাকি (Saki) ছদ্মনামে পরিচিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বর্মা দেশের আকিয়াব শহরে এঁর জন্ম হয়। বর্মার পুলিশ বিভাগে কিছুকাল কাজ করার পর ইনি সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। Morning Post, Bystander, Westminster Gazette প্রভৃতি পত্রিকার ইনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ছোটগল্প রচনায় ইনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। আখ্যানবস্তুর অভিনবত্বে ও সরস বর্ণনার গুণে এঁর প্রত্যেকটি গল্প উপভোগ্য। এঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে The Westminster Alice, Not So Stories, When William Came ও The Rise of the Russian Empire বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইনি সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে শত্রুপক্ষের আক্রমণে নিহত হন।

•

হাইড পার্কে একখানি বেঞ্চির উপর বসে আছেন নরম্যান গরটস্‌বি। পিছনে খানিকটা খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে সযত্নবর্ধিত লতাগুল্মের ঝোপ, সামনে রেলিঙের ওধারে প্রশস্ত রাজপথ, পথের দুধারে সুরম্য অট্টালিকার সারি। মার্চ মাসের সন্ধ্যা, ছ'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে, তবে চাঁদের অস্ফুট আলোয় অন্ধকারটা বেশ জমাট বাঁধতে পারছে না। পার্কের ভিতরের ছোট-বড় রাস্তাগুলি ফাঁকা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে দু'একজন লোক আবছা অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে, কেউ কেউ বা চেয়ারে বা বেঞ্চিতে নিঃশব্দে বসে আছে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢেকে।

দৃশ্যটা গরটস্‌বির ভালোই লাগল। তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার সঙ্গে আসন্ন সন্ধ্যার এই বিষাদময় দৃশ্য বেশ খাপ খেয়ে গেল। সন্ধ্যা

তাঁর কাছে পরাজিতের উপযুক্ত অবসর। জীবনযুদ্ধে পরাজিত যারা, অনুসন্ধিৎসু নরনারীর দৃষ্টি থেকে নিজেদের বেদনা ও গ্লানি যারা গোপন করতে চায়, তারা এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেই নির্জন গৃহকোণ থেকে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসে—কারণ এসময় তাদের অপরিচ্ছন্ন পোশাক আর নৈরাশ্যম্লান মুখ অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না।

অন্ধকারে যারা পায়চারি করছে তারা চায় অপরের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে। আর তাই তারা বাছুড়ের মতো এই সন্ধ্যাবেলায় এসেছে পার্কে বেড়াতে, যখন আনন্দপিয়াসী নরনারীর দল বিদায় নিয়েছে। রেলিঙের বাইরে আলো আর আনন্দের রাজ্য। ঐ যে বড় বাড়িটার সারি সারি জানালা অন্ধকারের মধ্যে আলোয় ঝলমল করছে ওটা তাদেরই আস্তানা যারা জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করেছে—অন্ততঃ পরাজয়ের বেদনা যাদের অন্তরকে বিদ্ধ করেনি। নির্জনে বেঞ্চির উপর বসে গরটস্‌বি এমনিধারা নানান্ চিন্তায় ডুবে আছেন। তাঁর মনের অবস্থা এখন এমন যে নিজেকে তিনি পরাজিতের দলের মধ্যেই মনে করেন। অর্থের অনটন যে তাঁর দুঃখের কারণ তা নয়। ইচ্ছা করলে তিনি ঐ আলো ও আনন্দ-ভরা রাজপথে আর সকলের মতো বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারেন। অর্থের স্বচ্ছলতা তাঁর আছে। মনের এক নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে তাঁর। তাই তাঁর মন এখন বেদনায় বিপর্যস্ত। ঐ অন্ধকার বাগানের মধ্যে যারা পায়চারি করছে তারাও যে তাঁরই মতো পরাজয়ের গ্লানি বহন করছে একথা মনে করে মনে মনে তিনি যেন খুশী হয়ে ওঠেন।

বেঞ্চিতে ঠিক তাঁর পাশেই এক আধাবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ না থাকলেও তাঁর মুখ দেখে মনে হয় যেন এককালে তাঁর যথেষ্ট তেজ ও আত্মসম্মানবোধ ছিল, তবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুঝে এখন যেন তাঁর সে উগ্রতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন বলা চলে না। অন্ততঃ সেই স্বল্পালোকের মধ্যে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়বার মতো নয়, তবে এটা ঠিক যে, তাঁর পোশাক দেখে কেউই কল্পনা করতে পারবে না যে

তাঁর পক্ষে আধ ক্রাউন দামের চকোলেটের বাক্স বা ন'পেনি দামের বাটন্‌হোলের ফুল কেনা সম্ভব হতে পারে। তিনি নিঃসন্দেহে তাদেরই একজন যাদের সঙ্গ ও সৌহার্দ্য দুনিয়ার কেউ আর কামনা করে না, সংসারে যাদের প্রয়োজন একান্তই ফুরিয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোকটি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন গরটস্‌বির মনে হল, হয় তিনি ফিরে চলেছেন তাঁর আত্মীয়পরিজনের কাছে যেখানে তাঁর কোন সমাদর নেই, আছে শুধু অবজ্ঞা ও গঞ্জনা, না হয় কোন নিরানন্দ হোটেল-ঘরে যেখানে তাঁর সাপ্তাহিক বিল পরিশোধ করবার সামর্থ্যটুকু একমাত্র আকর্ষণের বস্তু। ভদ্রলোকটি ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর আসনখানি অধিকার করল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক। পোশাকে তার পারিপাট্য আছে বটে, কিন্তু মুখখানা পূর্ববর্তী ভদ্রলোকের মতোই বিমর্ষ ও নিরানন্দ। দুনিয়ার উপর সে যে অত্যন্ত অপ্রসন্ন বোধ করি এই ভাবটিকে ব্যক্ত করবার জন্যই আগন্তুক আসন অধিকার করার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ক্রুদ্ধ স্বগতোক্তি করল। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা থাকায় উক্তিটা অস্ফুট হলেও গরটস্‌বির কানে এসে পৌঁছুল।

"আপনার মেজাজটা ভাল নেই বলে মনে হচ্ছে," মৃদুস্বরে বললেন গরটস্‌বি। এ অবস্থায় কিছু না বলা তাঁর কাছে নিতান্ত অশোভন বলে মনে হল।

যুবকটি সরল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে ফিরে তাকাল—"আমি যে অবস্থায় পড়েছি মশাই, আপনার যদি সেই অবস্থা হত, তাহলে আপনার মেজাজটাও ভালো থাকত কি না সন্দেহ। আমি অত্যন্ত বোকার মতো কাজ করেছি—যা আমি জীবনে কোনদিন করিনি।"

"ও" গরটস্‌বি জবাব দিলেন নিতান্ত নির্বিকারভাবে।

"আজ বিকেলে আমি এখানে এসেছি। বার্কশায়ার স্কোয়ারে প্যাটাগোনিয়ান হোটেলে আমার থাকবার কথা, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম, সে-বাড়ি কয়েক সপ্তাহ আগে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে আর সেই জায়গায় তৈরী হয়েছে একটা সিনেমা থিয়েটার। ট্যাক্সি-ড্রাইভার

আমাকে কিছুদূরের আর একটি হোটেলের কথা বললে এবং তার পরামর্শমতো সেখানেই গেলাম। এই কিছুক্ষণ আগে এখানকার ঠিকানা জানিয়ে, বাড়িতে চিঠি পাঠালাম আর তার পরই বেরিয়ে এসেছি সাবান কিনতে। সাবান সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি, আর হোটেলের সাবান ব্যবহার করতে প্রবৃত্তি হয় না আমার। হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ আমি এদিক-ওদিক পায়চারি করেছি, ঘুরে ঘুরে নানান দোকানের জিনিসপত্র দেখেছি এবং তারপর যখন হোটেলে ফিরবো বলে মনস্থ করছি তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে, হোটেলের নামও আমার মনে নেই আর কোন্ রাস্তায় যে সেই হোটেল তাও গেছি ভুলে। লণ্ডনে যার কোনো বন্ধু বা আত্মীয় নেই তার পক্ষে এ অবস্থা যে মারাত্মক তা সবাই বুঝতে পারবে না। অবশ্য আমি আমার আত্মীয়দের কাছে 'তার' করতে পারি হোটেলের ঠিকানাটার জন্যে, কিন্তু কালকের আগে তো খবরটা তাদের কাছে পৌঁছুবে না। আমার এদিকে হাতে টাকাকড়ি কিছুই নেই, মাত্র একটি শিলিং নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছিলাম সাবান কিনতে আর মদ্যপানে তার প্রায় সবই খরচ হয়ে গেছে, পকেটে দু'পেনি সম্বল করে আমি এখন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, রাতটা যে কোথায় কাটাবো তার ঠিক নেই।"

গল্পটা শেষ করার পর যুবকটি থামল, কিন্তু পরক্ষণেই বেশ একটু উষ্মার সঙ্গে বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি নিশ্চয় একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে বলছি, কেমন ?"

"না, মিথ্যা কেন হবে ?" গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন গরটস্‌বি - "মনে পড়ে আমিও একবার বিদেশে একটি শহরে ঠিক ঐ অবস্থায় পড়েছিলাম এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ছিলাম দুজন - দুজনেই হোটেলের নামটা গেছলাম ভুলে। সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে গেল হোটেলটা একটা খালের ধারে এবং যখন আমরা খালের কাছে পৌঁছুলাম তখন হোটেলটা খুঁজে নিতে বেগ পেতে হল না।"

গরটস্‌বির কথায় যুবকটি যেন একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল—"বিদেশে

এ ব্যাপারটা হলে মোটেই ভাবতাম না আমি। কন্‌সালের কাছে গিয়ে বললেই কিছু সাহায্য পাওয়া যেত। নিজের দেশে এরকম ব্যাপার ঘটলেই মুশকিল। এমন কোন সহৃদয় ভদ্রলোককে যদি পাই যিনি আমার অদ্ভুত গল্পটা বিশ্বাস করে আমায় কিছু টাকা ধার দিতে রাজী হন, তবেই মঙ্গল—নয়তো সারা রাত আমায় রাস্তায় কাটাতে হবে নিশ্চয়। যাই হোক, আমি ভারী খুশী হয়েছি এইজন্যে যে আপনি আমার গল্পটা একেবারে অসম্ভব মনে করেননি।" তার শেষের কথাটির মধ্যে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল, যেন তার আশা গর্বটস্‌বি ঐ সহৃদয়তাটুকু দেখাতে কুণ্ঠিত হবেন না নিশ্চয়ই।

"তবে সত্যের খাতিরে এটুকু বলতে হবে যে, আপনার গল্প একেবারে ত্রুটিবর্জিত নয়, কারণ আপনি গল্পে যে সাবানের উল্লেখ করেছেন সেই সাবান আপনি দেখাতে পারেননি।" ধীরভাবে মন্তব্য করলেন গর্বটস্‌বি।

যুবকটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওভারকোটের পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল, তারপর ব্যস্তভাবে উঠে দাড়িয়ে বললে, "সাবানটা হারিয়ে ফেলেছি মশাই।"

"ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে হোটেল ভুলে যাওয়া আর সাবান হারানো ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বলেই মনে হয়," গম্ভীরভাবে বললেন গর্বটস্‌বি, কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই যুবকটি বিরক্তিভরে সামনের সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি ধরে ত্বরিতপদে অগ্রসর হল। সে যে ভীত বা অপ্রস্তুত হয়েছে তা মনে হল না, সগর্বে মাথা উঁচু করে সে পার্কের অপরদিকে চলে গেল।

গর্বটস্‌বি মনে মনে ভাবলেন, হোটেল থেকে সাবান আনতে বের হওয়াটাই গল্পের মধ্যে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা, অথচ ঐ সামান্য ঘটনাটাই ওর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করে দিল। লোকটি যদি কিছু বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকে একখানি সাবান সংগ্রহ করে রাখতো—স্টেশনারি দোকানের সযত্নে প্যাক-করা সাবান—তাহলে ও নিশ্চয়ই নিজের ব্যবসায়ে একজন প্রতিভাবান কর্মী বলে গণ্য হত।

মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে গরজ্‌বিট বাড়ি ফিরবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়াতেই কি একটা জিনিস লক্ষ্য করে তিনি বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করলেন। বেঞ্চির পাশে মাটিতে পড়ে আছে সযত্নে বাঁধা একটা ডিম্বাকার প্যাকেট। ওটা সাবানের মোড়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই ওটা যুবকটির ওভারকোটের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল যখন সে বেঞ্চির উপর বসে। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল গরটস্‌বি যুবকটির সন্ধানে অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্কে এদিক-ওদিক ঘুরছেন। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর যখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেই সময় দেখতে পেলেন যুবকটি পার্কের ভিতরের একটা রাস্তার ধারে চিন্তিতমুখে দাঁড়িয়ে। সে যেন স্থির করতে পারছে না কী সে করবে—পার্কের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ ঘুরবে, না পার্কের বাইরে ঐ জনতাবহুল পথের দিকে পা বাড়াবে। গরটস্‌বির ডাক শুনে সে চমকে মুখ ফেরাল। পাছে আবার কোন অপমানকর মন্তব্য শুনতে হয় এজন্য তার মুখে কেমন একটা কঠিন রুক্ষতা ফুটে উঠল।

সাবানখানি তার মুখের সামনে তুলে ধরে গরটস্‌বি বললেন, "আপনার গল্পের সত্যতার প্রধান সাক্ষীটি হাজির হয়েছে। আপনি যখন বেঞ্চির উপর বসেন তখন ওটা নিশ্চয়ই আপনার ওভারকোটের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আপনি চলে যাবার পর আমি ওটা মাটির ওপর দেখতে পাই। আমার সন্দেহ আপনি ক্ষমা করবেন নিশ্চয়ই—কারণ আপনার গল্পের মধ্যে বিশ্বাস করবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না এ আপনি স্বীকার করবেন। যাই হোক, আমি যখন সাবানের সাক্ষ্য তলব করেছিলাম তখন তার নির্দেশও আমায় মেনে নিতে হবে। এক পাউণ্ড ধার পেলে আপনার যদি উপকার হয়, আমি আপনাকে ঐ টাকাটা--"

যুবকটি তাঁর সংশয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে তাড়াতাড়ি টাকাটা নিয়ে পকেটে পুরল।

"এই আমার কার্ড—এতে আমার ঠিকানা আছে," গরটস্‌বি প্রফুল্লমুখে বললেন, "এই সপ্তাহের মধ্যে যে-কোন দিন ফেরত দিলে

চলবে…আর এই আপনার সাবান, দেখবেন আবার যেন এটা হারাবেন না. এ আপনাব ভারী উপকার করেছে আজ।"

"আপনি যে এটা পেয়েছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য," যুবকটি বললে। তারপর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা পার্কের ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।

"বেচারা ভারী মুষড়ে পড়েছিল," মনে মনে বললেন গরটস্‌বি. "টাকাটা পেয়ে এ যাত্রা ও বেঁচে গেল। ঘটনার সাহায্যে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা যে কত অন্যায় তা আমি বুঝতে পারলাম।"

গরটস্‌বি যখন বাড়ি ফেরার পথে সেই বেঞ্চিটির পাশ দিয়ে চলেছেন সেই সময় তিনি দেখলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেঞ্চিটার নীচে ও আশেপাশে কি যেন খুঁজছেন। তাঁকে চিনতে দেরী হল না গরটস্‌বির, উনি তাঁরই পাশে বসেছিলেন যুবকটির আবির্ভাবের আগে।

"আপনার কি কিছু হারিয়েছে, মশাই?" জিজ্ঞাসা করলেন গরটস্‌বি।

"হ্যাঁ, একখানা সাবান।"

অন্তরঙ্গ বন্ধু

লুইজিপিরানদেল্লো (১৮৬৭—১৯৩৬) বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ ইতালীয় সাহিত্যিকদের অন্যতম। জন্ম সিসিলির অন্তগত গিরজেনতি শহরে। রোম ও বন এর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। নাট্যকার হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে The Man with the Flower in his Mouth, Six Characters in Search of an Author ও Henry V বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনাতেও তিনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে The Outcast ও The Old and the Young বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনায় ও বাকভঙ্গীর সরসতায় তার প্রতিটি গল্পই অপরূপ। ১৯৩২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

শীতের কনকনে হাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সর্বাঙ্গ ওভারকোটে আবৃত করে গিগি মিয়ার লাঙ্গো তিভিয়ার ঘ মেলিনিতে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অফিস তাঁর ভায়া পাস্ত্রেঙ্গোতে — তাড়াতাড়ি ট্রাম ধরতে না পারলে অফিসে পৌঁছুতে বেলা হয়ে যাবে।

কিন্তু ট্রামে যাঁরা চড়েন তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ট্রামের জন্যে যখন অপেক্ষা করা যায় তখন ট্রাম দুর্লভ হয়ে ওঠে। হয় কারেন্টের অভাবে মাঝপথে ট্রাম নিশ্চল হয়ে আছে, নয়তো কোন মোটর বা লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে অযথা বিলম্ব করছে।

তীক্ষ্ণ উত্তুরে বাতাস শন্ শন্ করে বইছে। মাঝে মাঝে পা ঠুকে গিগি মিয়ার শরীরটাকে একটু গরম করে নেবার চেষ্টা করছেন। অদূরে ধূসর রঙের যে ক্ষীণ নদীটি দেখা যায়, মনে হচ্ছে সে-ও যেন দারুণ শীতে জড়সড়—তার সে উচ্ছল লীলাচঞ্চল গতি নেই, হিমেল হাওয়ায় যেন তার সর্বাঙ্গ নীথর, অসাড়।

খানিক পরে দূরে ট্রাম দেখা গেল—টঙ টঙ করতে করতে এগিয়ে আসছে। চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে ওঠবার জন্যে গিগি মিয়ার তোড়জোড় করছেন এমন সময় হঠাৎ নতুন সেতু -পন্ত কাভুরের ওপর থেকে কে একজন তাঁর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল।

"গিগি! গিগি!"

গিগি মিয়ার দেখলেন এক ভদ্রলোক টেলিগ্রাফ পোস্টের মতো দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে করতে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। টঙ টঙ করতে করতে ট্রাম চলে গেল সামনে দিয়ে গিগি মিয়ারের ওঠা হল না। চলন্ত ট্রামের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। আলিঙ্গনের প্রচণ্ড চাপে মনে হল আগন্তুক যেন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

"তোমাকে দূর থেকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি, গিগি···এক মুহূর্তও দেরি হয়নি·· আশ্চর্য নয় কি? কিন্তু বন্ধু, তোমার চেহারা এমন বদলে গেল কি করে? এরই মধ্যে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ দেখছি -- চুলে পাক ধরেছে। বাস্তবিক তোমার মুখখানা দেখাচ্ছে ঠিক যেন বুড়ো পাদরীদের মতো তেমনি প্রশান্ত ও গম্ভীর। তোমার ঐ গম্ভীর মুখে একটা চুমো খেতে ইচ্ছে করছে আমার।·· তোমায় এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন আমারই জন্যে তুমি অপেক্ষা করছ তাই তুমি যখন ট্রামে ওঠবার জন্যে হাত তুললে তখন আমার মন বলে উঠল, এ ভারী অন্যায়, নিছক বিশ্বাসঘাতকতা···"

"হ্যাঁ, আমি আপিসে যাচ্ছিলাম," জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে মিয়ার বললেন।

"আপাতত ওসব বিরক্তিকর প্রসঙ্গের উত্থাপন নাই বা করলে?"

"তার মানে?"

"তার মানে এই যে, আজ আর তোমার আপিস যাওয়া হবে না।"

"বল কী? তুমি তো অদ্ভুত লোক হে!"

"হ্যাঁ, অদ্ভুত বৈকি। কিন্তু বল দেখি, আমি যে এখন আসবো তা

তুমি আশা করেছিলে কি? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি করো নি।"

"হ্যাঁ, করিনি···সত্যি কথা বলতে কি···"

"কাল সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছেছি। আমার মারফত তোমার দাদা তোমায় সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুনলে তুমি হাসবে নিশ্চয়, তিনি আমায় একখানা পরিচয়পত্র দিতে চেয়েছিলেন তোমার কাছে। আমি বললাম, বলেন কি? গিগিয়োনের কাছে পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে হবে? আমরা ছেলেবেলাকার বন্ধু···একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি, মারামারি করেছি বিস্তর···কলেজেও পড়েছি একসঙ্গে। পাড়ুয়ার কথা মনে পড়ে তোমার, গিগিয়োন? আমাদের হোস্টেলের সেই প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা—কী ভয়ানকই ছিল আওয়াজটা তার! তুমি কিন্তু বেপরোয়া ঘুমুতে—যেমন ঘুমোয় শূয়োরছানাগুলো।···হ্যাঁ, একবার ঐ আওয়াজ তোমার কানে গিয়েছিল বটে - তুমি ধড়মড় করে উঠে বসে জিগ্যেস করেছিলে, আগুন লেগেছে নাকি? তুমি ভেবেছিলে ও আওয়াজ বুঝি আগুন লাগার সঙ্কেত! কলেজের সেই দিনগুলো কী মজারই ছিল! ··যাক ও সব কথা, তোমার দাদা আছেন ভাল। আমরা দুজনে সামান্য একটা কারবার ফেঁদেছি, সেই উপলক্ষেই এখানে আসা। ···কিন্তু তোমার হল কী? তুমি যেন কেমন মিইয়ে গিয়েছ সে স্ফূর্তি আর নেই। বিয়ে করেছ তো?"

"না, করিনি," গর্বের সঙ্গে জবাব দিলেন গিগি মিয়ার।

"করবার মতলব আছে তো?"

"ক্ষেপেছ নাকি? চল্লিশের পর কি আর বিয়ে করা সাজে? ও কথা ভাবতেও পারি না।"

"চল্লিশ! তোমার বয়স বোধ করি পঞ্চাশ হতে চলল, গিগিয়োন। ···হ্যাঁ, একটা কথা আমি ভুলে যাচ্ছিলাম—ঘণ্টার আওয়াজের দিকে তোমার যেমন খেয়াল নেই, বয়সের সম্বন্ধেও তুমি চিরদিন তেমনি নির্বিকার। এটা তোমার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য—যারা তোমায় চেনে তাদের এটা অজানা নেই। তবে বন্ধু, বয়স যে তোমার পঞ্চাশ

এসম্বন্ধে আমি একরকম নিশ্চিত। তুমি জন্মেছিলে…দাঁড়াও একটু ভেবে বলছি…১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে…নয় কি? খুব সম্ভব ১২ই এপ্রিল।"

"এপ্রিল নয়—মে…আর বছরটাও ভুল…আঠারো শো বাহান্ন সালে আমার জন্ম," একটু রাগতভাবে বললেন গিগি মিয়ার—"আমার জন্ম-তারিখ আমার চাইতে ভালো জানো তুমি? আমি বলছি -১২ই মে, ১৮৫২। কাজেই আমার বয়স এখন উনপঞ্চাশ বছর কয়েক মাস মাত্র।"

"আর এই বয়সেও বিয়ে করে ঘরসংসার পাতো নি! ভালোই করেছ বন্ধু, বিয়ে করা যে কী ঝকমারি তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার বিয়ের ব্যাপার তুমি যদি শোন, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবে তোমার। হ্যাঁ, কি বলছিলাম… আজ তাহলে আমি তোমার অতিথি…বুঝলে গিগি, লাঞ্চটা তোমার সঙ্গেই খাওয়া যাবে। আজকাল তুমি খাও কোথায় বল তো? বার্বায়, না আর কোথাও?"

"অ্যাঁ, বল কি!" বিস্ময়ের সুরে বললেন গিগি মিয়ার—"বার্বার কথাও তুমি জানো দেখছি! ওখানে তোমার যাতায়াত আছে বুঝি?"

"মোটেই না। আমি থাকি পাডুয়ায়, বার্বায় যাতায়াত করবো কি করে? লোকের মুখে শুনেছি- ওখানে যারা যায় তাদেরই মুখে। ওখানে তোমাদের যেসব স্ফূর্তি-টুর্তি হয় তার খবরও কিছু কিছু রাখি।"

"কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চাও তাহলে বাড়ি যেতে হয়- -ঝিকে একবার খবর দেওয়া দরকার," বললেন মিয়ার।

"ঝি? যুবতী নাকি?"

"না হে না, বৃদ্ধা। আজকাল আর বার্বায় যাই না আমি- -বছর তিনেক আমোদপ্রমোদ ছেড়ে দিয়েছি। কি জানো, একটা বয়স আছে…"

"চল্লিশের পর—" বন্ধুটি বললে ব্যঙ্গের সুরে।

"হ্যাঁ, চল্লিশের পর যখন তোমায় মোড় ফিরতেই হবে। বরীবর

যে-পথে চলেছ সে-পথে চলা তখন আর নিরাপদ নয়।...হ্যাঁ, এবার ডানদিকে ফেরো...তাড়াতাড়ি করো না, রাস্তাটা ঢালু, হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যাও...এইবার এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসো...এই আমার বাড়ি...কেমন সাজিয়েছি দেখবে চল।"

"তোমার রকম-সকম দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, গিগি," সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বন্ধুটি বললে, "বরাবরই তুমি ডানপিটে, ভয়-ভাবনা তোমার কোনদিনই দেখিনি আর আজ কিনা তুমি সাবধান হতে উপদেশ দিচ্ছ! হেঁটে চলেছি, তাতেও তোমার ভয় একটা কিছু বিপদ না ঘটে। তোমার এ হল কী, গিগি? কে তোমায় এমন শান্ত গোবেচারী বানালো বল দেখি? দেখে শুনে আমার তো চোখে জল আসছে।"

কথা বলতে বলতে তুজনে দরজার সামনে এসে উপস্থিত। মৃদু হেসে মিয়ার বললেন, "দেখো জীবনে ঝামেলার অন্ত নেই—এই বয়সে জীবনের সঙ্গে একটা আপোস করে নিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন যদি অনবরত বিদ্রোহ করো, তবে তোমার মতো মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব—দিনে দিনে তুমি জানোয়ারের সামিল হয়ে যাবে।"

"তাহলে তুমি জানোয়ারের অবস্থার চেয়ে মানুষের অবস্থাটা ভাল বলে মনে কর?" বাধা দিয়ে বন্ধুটি বললে- "তা যদি কর তাহলে তুমি ভুল করেছ জেনো। তু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে আমার যে মাঝে মাঝে কী বেগই পেতে হয় তা আমি জানি। বিশ্বাস করো বন্ধু, আমরা যদি প্রকৃতিকে যথেচ্ছা কাজ করবার সুযোগ দিই তাহলে আমরা আর কেউই দ্বিপদ মানুষ থাকবো না, সবাই হয়ে যাবো চতুষ্পদ জন্তু। বাস্তবিক ওর চেয়ে আরামের অবস্থা আর কী হতে পারে আমি কল্পনাই করতে পারি না। অসাবধান হলে পড়ে যাবার আশঙ্কা নেই, ব্যালান্সটা সব সময়েই থাকে ঠিক। কবে যে আমরা জানোয়ারের মতো চার পায়ে চলবার সৌভাগ্য অর্জন করবো কে জানে! এই অভিশপ্ত সভ্যতাই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। আমি যদি চতুষ্পদ হতে পারতাম, তাহলে পরমানন্দে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম।...ন

থাকতো স্ত্রী, না থাকতো দেনা, না থাকতো কোন উদ্বেগ। তুমি কি চাও মানুষ হয়ে থেকে সারা জীবনই কষ্ট পাবো আমি?"

হঠাৎ আবির্ভূত এই বন্ধুর অদ্ভুত রহস্যালাপে মিয়াব হতভম্বের মতো তার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তার নামটা কী, কোথায় ও কবে আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে, বাল্যবয়সে কি পঠদ্দশায় কলেজে— কিছুই তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর যে সমস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল মনে মনে তাদের কথা বার বার চিন্তা করতে লাগলেন কিন্তু কারুরই চেহারা এই লোকটির সঙ্গে মেলে না। তবু ঐ সম্বন্ধে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না তাঁর--লোকটি যেরকম অন্তরঙ্গতা দেখাচ্ছে তাতে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাটা অভদ্রতা হবে—হয়তো বা সে চটেও যেতে পারে। কৌশলে তার পরিচয় জেনে নেবেন মনে মনে এই সঙ্কল্প করে আপাতত চুপ করে রইলেন।

পরিচারিকার আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। মনিব যে এত শীঘ্র ফিরে আসবেন তা সে ভাবতেই পারেনি। গিগি মিয়ার দ্বিতীয় বার ঘণ্টা বাজালেন। খানিক পরে পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল।

"আপিস যাওয়া আজ আর হল না," পরিচারিকাকে উদ্দেশ করে মিয়ার বললেন. "এই বন্ধুটির সঙ্গে পথে হঠাৎ দেখা - সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। আমাদের ২জনের জন্য চট্‌পট্ খাবারের ব্যবস্থা করো।··· সাবধান কোন ত্রুটি হয় না যেন, আমার বন্ধুটি যে সে লোক নন, ওঁর বুদ্ধি যেমন অসাধারণ, নামটাও তেমনি অদ্ভুত "

"এ্যানথ্রপোফ্যাগাস্‌গেট্‌স্‌বীয়ার্ডহরনফুট্." বন্ধুটি বললে রহস্য করে।

নামটা শুনে ঘাবড়ে গেল পরিচারিকা -সে হাসবে, না চুপ করে থাকবে কিছুই আন্দাজ করতে পারল না।

"আমার ঐ চমৎকার নামটি সম্বন্ধে কেউই কিছু জানতে চায় না কোনদিন," পরিচারিকাকে লক্ষ্য করে মিয়ারের বন্ধু বলে চলল, "নামটির এমনি মাহাত্ম্য যে ব্যাঙ্কের কর্তারা শুনলে মুখ বিকৃত করে আর মহাজনরা ভিরমি খেয়ে পড়ে যায়। আমার স্ত্রীই কেবল

ব্যতিক্রম--একমাত্র সে-ই নামটা নিয়েছে খুশীমনে। তবে শুধু নামটাই দিয়েছি তাকে, আমার আর কিছুই দিইনি। আমার মতো একজন সুপুরুষ--বুঝেছ কিনা, যেমন তেমন একজন স্ত্রীলোককে ভালবাসবে, তাই কি কখনও হয়? ··এবার চলো, গিগি, বাড়ির ভেতর—দেখিগে গৃহস্থালীর ব্যাপারে কতখানি পোক্ত হয়েছ তুমি।···আর তুমি, পরিচারিকা ঠাকরুণ, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। ক্ষিদেয় আমাদের পেট জ্বলছে—খাবারের বন্দোবস্তটা চট্‌পট্ করে ফেলো।"

কৌশলটা ব্যর্থ হওয়ায় মিয়ার একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কোনো কাজেই হাল ছেড়ে দেওয়া তাঁর স্বভাব নয়। বন্ধুটিকে নিয়ে তিনি তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটটির চারিদিক দেখাতে লাগলেন। পাঁচটি ছোট ছোট ঘর--সবই সযত্নে সাজানো। একখানি বসবার ঘর, একটি শোবার ঘর, ছোট্ট একটি স্নানের ঘর, খাবার ঘর আর পড়বার ঘর।

বন্ধুটিকে সঙ্গে করে মিয়ার যখন বসবার ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর বিস্ময় ও বিরক্তি সীমা ছাড়িয়ে গেল। ম্যানটেলপিসের ওপর সাজান ফোটোগ্রাফগুলি নিরীক্ষণ করতে করতে বন্ধুটি মিয়ার-পরিবার সম্বন্ধে এমন সমস্ত ব্যাপারের গল্প করতে শুরু করল যা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া বড় একটা কেউ জানে না।

"গিগিয়োন, খাসা লোক তোমার ভগ্নীপতিটি --আমার যদি অমন একটি ভগ্নীপতি থাকতো!···আমার ভগ্নীপতিটি, বুঝেছ কিনা, বদমায়েসের সেরা!"

"কেন? তোমার বোনের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করেন নাকি?"

"না, তিনি খারাপ ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে। আমার এই তুঃসময়ে অনায়াসে তিনি সাহায্য করতে পারতেন--কিন্তু করবেন না কিছুতেই।"

"তোমার ভগ্নীপতির নামটা ঠিক মনে পড়ছে না," মিয়ার মাথা চুলকোতে লাগলেন—"নামটা কি বলতো?"

"তার নাম তোমার মনে পড়বে কি করে? তাকে তুমি মোটেই

চেনো না। পাডুয়াতে সে এসেছে মাত্র দু'বছর আগে। আমার সঙ্গে সে যেরকম ব্যবহার করেছে তা তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তোমার দাদা আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন যদি ঐ হতভাগাটা আমার হুণ্ডী নিতে আপত্তি না করে। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম তাই—লোকটা কিছুতেই সই করল না--কত করে তাকে মিনতি করলাম, কিছুতেই নরম হল না সে। তোমার দাদা—সত্যি বল্‌ছি অমন লোক আজকালকার দিনে দুর্লভ, আমার সঙ্গে কীই বা তাঁর সম্পর্ক,—ব্যাপারটা শুনে এমনি তিনি চটে গেলেন আমার ভগ্নীপতির ওপর যে আর কারো তোয়াক্কা না করে নিজেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর সাহায্যেই এখন হয়তো আমি কতকটা দাঁড়াতে পারবো বলে ভরসা করছি।···হ্যাঁ, ভগ্নীপতি রাজী হল না কেন সে কথা বলা হয়নি তোমায়। আমার চেহারায় যে এখনও বেশ জৌলুস আছে এ তুমি অস্বীকার করতে পার না -দেখলেই সবাই আকৃষ্ট হয়। ···আমার ভগ্নীপতির বোন – হঠাৎ কি জানি কেমন করে আমার প্রেমে পড়ে গেল···বেচারী !···মেয়েটির রুচির প্রশংসা করি বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা একটু কাঁচা। আমি আর কি করতে পারি বল---বিয়ে তো আর করলেই হল না! কিন্তু মেয়েটি এক কাণ্ড করে বসল—মনের দুঃখে বিষ খেল সে !"

"বল কী? মেয়েটি মারা গেল?" শঙ্কিতমুখে প্রশ্ন করলেন মিয়ার।

"না -সে বমি করল খানিকটা আর তাতেই সে আরাম হয়ে গেল। কিন্তু এ ঘটনার পর ভগ্নীপতির বাড়ি মাড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল।···আরে খাবারের দেখা নেই যে! ক্ষিদেয় যে চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি না···পেট যে বাপান্ত করছে !"

খেতে বসে বন্ধুটি পরিহাসচ্ছলে যে সব কুৎসিত প্রসঙ্গের অবতারণা করল তাতে মিয়ার মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কথার স্রোত ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে মিয়ার বন্ধুকে পাডুয়া সম্বন্ধে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। মিয়ার মনে মনে এ আশাও

পোষণ করছিলেন যে কথা বলতে বলতে বন্ধুটি হয়তো একসময় নিজের নামটা প্রকাশ করে ফেলতে পারে।

"আচ্ছা ভালভার্দের খবর কী···ব্যাঙ্ক অভ্ ইটালীর ডিরেক্টার· যার স্ত্রীটি খুব সুন্দর আর বোনটি অসম্ভব মোটা আর ট্যারা? ওরা কি পাডুয়ায় আছে এখনও?"

মিয়াবের প্রশ্নে বন্ধুটি হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসির বেগ এমনি যে থামতেই চায় না।

"ব্যাপার কী!" কৌতূহলী চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলেন মিয়াব "ভালভার্দের বোন কি ট্যারা নয় তাহলে?"

"তুমি একটু চুপ কর ভাই -ভগবানের দোহাই, একটু চুপ করো." মিনতির সুরে বন্ধুটি বললে। হাসির ধমকে তখনও তার সর্বাঙ্গ আন্দোলিত হচ্ছিল।

"ট্যারা? হ্যাঁ, ট্যারা বৈকি। আর তার নাকের গর্তটা এত চওড়া যে মস্তিষ্ক পর্যন্ত দেখা যায়। ওরই কথা তো বলছিলাম তোমায়।"

"কিরকম?"

"বুঝলে না! ঐটিই তো আমার স্ত্রী।"

"বল কী!" অপরাধীর মতো গিগি মিয়াব মাথা চুলকাতে লাগলেন। ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু গুছিয়ে ঠিক বলতে পারলেন না। কিন্তু আগের চেয়েও প্রবলভাবে বন্ধুটি হাসতে শুরু করল। তারপর তার হাসির বেগটা কমে এল ক্রমশ, একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে সে বললে, "দেখো বন্ধু, আমাদের জানার বাইরে সৎসাহসের এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা কোন কবিও কোনদিন কল্পনা করতে পারবে না।"

"হুঁ· ·তুমি ঠিকই বলেছ," গম্ভীরমুখে সায় দিলেন গিগি মিয়াব — "তুমি যা বলতে চাও তা আমি বুঝেছি।"

"কিছুই তুমি বোঝনি," সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল বন্ধু--"তুমি বুঝি ভাবছ আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি! মোটেই না সৎসাহস আমার নয়, আমার স্ত্রীর ভ্রাতৃবধূর – অর্থাৎ লুসিও ভালভার্দের স্ত্রীর

আমার কথাটা দয়া করে শেষ পর্যন্ত শোন। মানুষ এমন নিরেট বোকাও হতে পারে!"

"কে? আমি?"

"না হে না, আমি।···লুসিও ভালভার্দের স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় ছিল আমার—অবশ্য বিয়েব আগে থেকেই। মাঝে মাঝে তাই দেখা করতে যেতাম গোপনে। ভাবতাম ভালভার্দ টের পাবে না কিছুতেই। ভালভার্দ আপিসে যাবার পর তার স্ত্রী আমায় ভেতবে নিয়ে আসত - নিশ্চিন্ত আরামে আমরা গল্প কবতাম। কিন্তু ব্যাটা যে তলে তলে খোঁজ বাখে তা কে জানত! একদিন কি হয়েছে জানো, দুজনে বসে গল্প কবছি, এমন সময় হঠাৎ ভালভার্দ বাড়ি এসে হাজিব। ভালভার্দ এসেছে জানতে পেবেই তাব স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমায় লুকিয়ে ফেললে তাব ননদেব ঘবেব মধ্যে। ননদটি কে বুঝতে পেরেছ তো? সেই স্থূলাঙ্গী ট্যাবা মহিলাটি। অকস্মাৎ আমার আবির্ভাবে ভদ্রমহিলা কাপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে আমায় অভিবাদন কবলেন একান্ত শুদ্ধচিত্তে মনে হল ভায়েব শান্তি ও সম্মান রক্ষাব জন্য আত্মোৎসর্গ কবতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'কিন্তু লুসিও কি বিশ্বাস কবতে চাইবে যে··' আমার কথা শেষ হবাব আগেই লুসিও রাগে গর্জন করতে কবতে ঘবে এসে ঢুকল—আর তারপর যা ঘটল তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারো।"

"তোমায় বুঝি সে বেদম্ প্রহার করলে?" শঙ্কিতমুখে জিজ্ঞাসা কবলেন মিয়াব।

"শুধু কি তাই- আমার **note of credit**-ও সে দিল খারিজ করে --অর্থাৎ আমায় একেবারে পথে বসিয়ে দিল। এরকম হীনতা দেখেছ কোথাও? যাক, ও সম্বন্ধে আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না কিছু।··· মোটেব ওপর ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই, আমার হাতে এখন একটি কপর্দ্দক নেই, কোথাও যে কিছু পাবো তারও ভরসা দেখছি না! বিবাহ করবার মতলব কোনদিনই আমার নেই যদিচ···"

"অ্যাঁ! তুমি না বললে ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করেছ!" বাধা দিয়ে বললেন গিগি মিয়ার।

"বিশ্বাস করো আমায়, বিবাহ আমি করিনি। সে-ই আমায় বিবাহ করেছে—বিবাহ হয়েছে তারই। আমি গোড়াতেই আমার অক্ষমতা তাকে জানিয়েছিলাম। ঘোরপ্যাঁচ আমি ভালবাসি না. সোজাসুজি তাকে বললাম, হে সুন্দরি, আমার নামটি তুমি চাও—তোমার বাসনা আমি অপূর্ণ রাখতে চাই না। সত্যি বলছি নামটা নিয়ে কী যে করবো আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই না।"

"তাহলে ব্যাপারটার ঐখানেই সমাপ্তি হল," মন্তব্য করলেন মিয়ার—"আগে ওর নাম ছিল ভালভার্দি, এখন নাম হল ··"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," টেবিল থেকে উঠতে উঠতে বন্ধুটি সহাস্যে বললে।

"উঠলে চলবে না—শোন," সাহসে ভর করে গিগি মিয়ার বললেন। মিয়ারের ধৈর্য শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে এরকম সংশয়ের মধ্যে কতক্ষণ আর থাকা যায়? "আজকের দিনটা তোমার সাহচর্যে বেশ আনন্দেই কেটেছে। তোমাকেও খুশী করবার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এখন তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

"প্রার্থনা? আমার স্ত্রীকে ধার চাও বুঝি?"

"না, ধন্যবাদ। আমি তোমার নামটি জানতে চাই।"

"নাম? আমার?" বন্ধুটি অবাক হয়ে গেল।--"আমার নাম কি তুমি জানো না?"

"না," লজ্জিতমুখে জবাব দিলেন মিয়ার --"আমায় ক্ষমা করো বন্ধু, ইচ্ছা হয় আমার স্মৃতিশক্তিকে দোষারোপ করো-- কিন্তু একথা আমি একরকম হলফ করেই বলতে পারি যে, তোমায় আমি আগে কোথাও দেখিনি।"

"ওঃ, তুমি তাহলে একেবারেই ভুলে গেছ দেখছি," মৃদু হেসে বন্ধুটি বললে। তারপর একটু থেমে গিগির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "তোমার হাতখানা দাও, গিগি—তোমার লাঞ্চের জন্য

অশেষ ধন্যবাদ। বাস্তবিক, এমন চমৎকার ভোজ অনেক কাল জোটেনি। ...কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই আমায় বিদায় নিতে হবে। এখন তবে আসি।"

"বলবে না? তোমায় বলতেই হবে!" উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন গিগি। "সারাদিনটা আমি মাথা ঘামিয়েছি ঐ নিয়ে আর তুমি না বলে চলে যাবে! বলতেই হবে।"

"খুন করবে নাকি?" শান্তভাবে গিগির মুখের পানে তাকিয়ে বন্ধুটি বললে- "আমায় টুকরো টুকরো করে কাটলেও আমি বলবো না।"

"রাগ করো না –স্থির হয়ে বসো," স্বরটা নরম করে গিগি মিয়ার বললেন, "এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে আমার কখনও হয়নি—এই স্মৃতির বিলোপ। এ যে কী যাতনার সৃষ্টি করে তা বলা যায় না। তোমার নামটা কেবলি স্মরণ করবাব চেষ্টা করছি অথচ পারছি না—এ একেবারে অসহ্য। ভগবানের দোহাই, তোমর নামটা একবার বলো।"

"চেষ্টা করে দেখো– খুঁজে পাও যদি।"

"কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ বল দেখি? তোমায় আমি ভুলে গেছি সত্য, তবু তোমার এতটুকু অনাদর করিনি—ঘরে এনে যত্ন করে খাইয়েছি, আর বিশ্বাস করো আমায়, তোমার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় না থাকলেও এই ঘণ্টা কয়েকের আলাপেই তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছ। তোমার ওপর আমার একটা ভালবাসা জন্মে গেছে, চমৎকার দিলখোলা মেজাজ তোমার, সর্বদা তোমাব সাহচর্য পেলে খুবই খুশী হবো আমি।"

"ওসব বলা বাজে," বন্ধুটি নিরাসক্তভাবে বললে, "আমার অভাব কোনদিনই তুমি বোধ করোনি, করবেও না। বৃথা তুমি অনুরোধ করছ। তোমায় পরিচয় না দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করতে চাও? এ আনন্দ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত—তোমার এখানে আসবার আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি।...না, পরিচয় আমি দেবো না। তোমার অনুরোধ নিতান্ত

অসঙ্গত—আমি বেশ বুঝতে পারছি আমায় তুমি একেবারে ভুলে গেছ। এতে অবশ্য আমার কষ্ট পাবার কথা, তবে তুমি যদি আমায় আর পীড়াপীড়ি না করো তাহলে ঐ কষ্টটুকু অনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পারবো। যাক্, এখন তবে বিদায় হই।"

"হ্যাঁ, যত শীঘ্র পারো—ঐটেই এখন আমার প্রার্থনা," মিয়ার অসহিষ্ণুভাবে বললেন—"আর আমি তোমায় বরদাস্ত করতে পারছি না।"

"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তবে গিগি, যাবার আগে তোমার একটি চুমো চাই—কালই আবার আমায় ফিরতে হবে।"

"না, কিছুতেই না," গর্জে উঠলেন মিয়ার—"যতক্ষণ না নামটা বলছ।"

"ও আশা বৃথা। আজ তবে এই পর্যন্ত···বিদায়।"

হাসতে হাসতে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সিঁড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে রহস্যভরে একটা চুম্বন ছুঁড়ে দিল মিয়ারের দিকে।

একটি রাত্রি

ভিসেন্ত ব্লাস্‌কো ইবানেৎস (Vicente Blasco Ibanez) ১৮৬৭ সালে স্পেনের অন্তর্বর্তী আরাগনে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে ইনি আইন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অধ্যয়ন সমাপ্তির পর আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হয়ে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য ইনি একাধিক বার কারাবরণ করেন। ১৯২৮ সালে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে Four Horsemen of the Apocalypse ও Blood and Sand সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই দুইখানি বই ছায়াচিত্রে রূপায়িত হওয়ার পর প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর অসাধারণ অভিনয়গুণে আরো বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে।

রাত্রি এগারোটা। প্যারিব রঙ্গালয়গুলি সবেমাত্র দ্বার বন্ধ করেছে। আধ ঘণ্টা আগে কাফে ও রেস্তোরাঁগুলি বন্ধ হয়েছে। পথের একপাশে আমরা ক'জন দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে দাঁড়িয়ে। রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে জনতার স্রোত ক্রমশ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। রাস্তার ঢুলিঢাকা ল্যাম্পের আবছা আলো অন্ধকারের সঙ্গে যুঝতে পারছে না, বারবার পরাজিত হয়ে ফিরে আসছে। গৃহগামী পথিকের দল মাঝে মাঝে ত্রস্ত দৃষ্টি তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। কালো আকাশের বুকে দু'চারটে নক্ষত্র এদিক ওদিক দেখা যায়। একসময় আকাশে দেখা যেত শুধু নক্ষত্র, এখন সার্চ-লাইটের চকিত আলোয় আকাশে মাঝে মাঝে সিগারাকৃতি জেপেলিন চোখে পড়ে।

রাতটা বাইরে কাটানোই আমাদের ইচ্ছা। আমরা সবসুদ্ধ চারজন। একজন ফরাসী লেখক, দুজন সার্বিয়ান ক্যাপটেন আর আমি। এই অন্ধকার রাত্রে কোথায় যে আমরা আশ্রয় নেবো তা ঠিক করতে পারছিলাম না। শহরের সব বাড়ির দরজাই তো বন্ধ হয়ে

গেছে। সার্বিয়ান ক্যাপটেনদের একজন একটি শৌখিন হোটেলের কথা বলল যেখানে সারারাতই লোকের আসা-যাওয়া চলে। যে-সব অফিসার রাতটা আমোদ করে কাটাতে চায় তারা সচরাচর ওখানেই জোটে। যখনই কোন সৈনিক প্যারিতে আসে অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে তখনই এ তথ্য সহকর্মীরা তাকে জানিয়ে দেয় গোপনে। খুব সাবধানে আমরা হোটেলের ভিতর ঢুকলাম। উজ্জ্বল আলোয় চতুর্দিক আলোকিত। এতক্ষণ অন্ধকারে চলার পর হঠাৎ আলোর মাঝখানে এসে চোখ ধেঁধে গেল। ঘরখানা যেন এক বিরাট লাইটহাউসের অভ্যন্তরভাগ -চারিদিকে অসংখ্য আয়না, আয়নার গায়ে ঘরের বিচিত্র সাজসজ্জা প্রতিবিম্বিত। মনে হল আমরা যেন দু'বছর পিছিয়ে গেছি। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত বিলাসিনী তরুণীর দল, শ্যাম্পেনের গ্লাস, বেহালার চিত্তস্পর্শী করুণ ঝঙ্কার যুদ্ধের আগে এসব জায়গায় যে-দৃশ্য চোখে পড়ত অবিকল তাই। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে একজনও সান্ধ্য পোশাক পরে আসেনি। ফরাসী, বেলজিয়ান, ইংরেজ, রাশিয়ান সকলেরই গায়ে সামরিক পোশাক আর সে পোশাক জীর্ণ ও ধূলিধূসর। জন কয়েক ইংরেজ সৈনিক বেহালা বাজাচ্ছিল করুণ সুরে আর মাঝে মাঝে মৃদু হাস্যের সঙ্গে প্রশংসমান জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করছিল, তবে সে হাসি যেন নিষ্প্রাণ, অন্তঃসারশূন্য আগেকার দিনের লাল কোর্তা-পরা জিপসিদের স্থান অধিকার করেছে ওরা। ওদের একজনকে লক্ষ্য করে মেয়েরা ফিস্‌ফিস করতে থাকে—তার বাপের নামটা বলাবলি করে বাপ লর্ড বংশমর্যাদা ও ঐশ্বর্যে স্বদেশে বিখ্যাত।

হোটেলের প্রমোদকক্ষে উৎসবের যেন সমারোহ। রণদেবতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছে ওরা। তাই আজ জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষে ওরা পান করতে চায় - হাসছে, গাইছে, নারীর প্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছে। প্রভাতে বিঘ্নসঙ্কুল সমুদ্রে যাত্রা করার আগে নাবিকেরা যেমন রাত্রিটা উদ্দাম আনন্দে কাটিয়ে দেয় এও ঠিক তেমনি।

সার্বিয়ান দুজনই তরুণ। নিয়তির রহস্যময় সঙ্কেতে আজ ওরা যাযাবর, কিন্তু এর জন্য কোন দুঃখ নেই ওদের, বরং স্বদেশের ক্ষুদ্র শহরের একঘেয়ে জীবনধারা থেকে মুক্ত হয়ে ওরা যে আজ ধনীদের বিলাসতীর্থ প্যারি শহরে উপস্থিত হয়েছে এর জন্য মনে মনে খুশী বলেই মনে হল।

গল্প বলতে হয় কেমন করে তা ওরা দুজনেই জানে। ওদের দেশে সকলেই যেখানে কবি—গল্প বলার ক্ষমতাকে কেউই অসাধারণ মনে করে না। অনেককাল আগে লা মার্টিন যখন তুর্কীশাসিত সার্বিয়ায় পদার্পণ করেন তখন ঐ মেষপালক ও যোদ্ধার দেশে কাব্যের সমাদর দেখে অবাক হয়েছিলেন। ওখানে খুব কম লোকই তখন লিখতে পড়তে পারত, অথচ কাব্য রচনায় সবারই ছিল পরম উৎসাহ—ওদের যা কিছু চিন্তা ও অনুভূতি সবই কাব্যে রূপায়িত হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ক্যাপটেন দুজন মাস কয়েক আগেকার এক শোচনীয় ঘটনা আলোচনা করছিল। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ক্ষুধায় আর শীতে কষ্টের অবধি ছিল না বরফের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই, দশজনের বিরুদ্ধে একজন, ভয়ত্রস্ত মানুষ আর পশুর ভীড়, প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল ছুটাছুটি আর ঠেলাঠেলি—পিছনে শত্রুর মেশিন গানের অবিরাম গুলিবর্ষণ—লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে আহতের আর্তনাদ পথের দুপাশে আহত নারীদের ক্ষতবিক্ষত দেহ, আকাশে অপেক্ষমাণ শকুনির দল বাতে পঙ্গু রাজা পিটার তুষারাবৃত পাহাড়ের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে পলায়নে তৎপর, লাঠির উপর ভর দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে নীরবে তিনি চলেছেন নিয়তির ক্রূর ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে।

সার্ব দুজন যখন পরস্পরের সঙ্গে আলাপে রত তখন আমি ভালো করে তাদের লক্ষ্য করছিলাম। বয়সে ওরা দুজনেই তরুণ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, নাকের গঠন ঈগলের ঠোঁটের মতো। গোঁফের রঙ কালো, দুপাশ সরু করে ছাটা। টুপীর নীচে থেকে কয়েক গুচ্ছ চুল বক্রভাবে

কপালের উপর এসে পড়েছে। ওদের চেহারা অনেকটা ভাবুক শিল্পীর মতো—গায়ে বাদামী রঙের সামরিক পোশাক রয়েছে এই যা, নইলে ঠিক ঐ ধরনের চেহারাই ভাবপ্রবণ তরুণীদের কাছে সমাদর লাভ করত চল্লিশ বছর আগে।

ওদের গল্প চলতে থাকে। কয়েক মাস আগে যে ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল বটে, কিন্তু ওদের উৎসাহদীপ্ত চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওরা সুদূর অতীতের কোন স্বপ্নময় আখ্যান বর্ণনা করছে- যেন সার্বীয় বীর মার্কো ক্রেলোভিচ বনের অপদেবতা উইলাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ!

কিছুকাল আগে পর্যন্ত ওরা আদিম সমাজের হিংস্র বর্বর জীবন যাপন করেছে। আজও তার স্মৃতি যেন ওদের অন্তর অধিকার করে রেখেছে।

আমাদের ফরাসী বন্ধুটি বিদায় নিল। সার্ব যুবকদের আলোচনা তখনও থামেনি, তবে ওদের মধ্যে যে তখন কথা বলছিল তার উৎসাহ যেন একটু কমে এসেছে। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে পাশের টেবিলের দিকে সে দৃষ্টি হানছিল। পালকযুক্ত মস্ত একটা টুপীর নীচে দুটো কালো চোখের একাগ্র দৃষ্টি যুবকটির মুখের দিকে নিবদ্ধ। যুবকটি নিঃসন্দেহেই লক্ষ্য করেছিল সেটা আর তাই বোধ করি তার এই আকস্মিক চাঞ্চল্য। গল্পের ফাঁকে একসময় সে আমাদের টেবিল থেকে উঠে পাশের টেবিলে গিয়ে বসল। ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ বলেই কেউই সেটা লক্ষ্য করল না। খানিক পরে দেখলাম, যুবকটি সেখানে নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে সেই টুপী আর কালো চোখের চুম্বক দৃষ্টি।

সার্ব তিনটির মধ্যে বয়সে যেটি অপেক্ষাকৃত ছোট সে-ই শুধু এখন আমার সঙ্গে—বাকী দুজন বিদায় নিয়েছে। একটু আগে যে আলোচনা চলছিল তাতে ও যোগ দিয়েছিল বটে, তবে কথা কয়েছে সবচেয়ে কম। এক পাত্র মদ পান করে দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার পানে ও তাকাল। তারপর আবার এক পাত্র মদ ঢেলে

নিয়ে খেতে শুরু করল। পাত্রটা নিঃশেষ করে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে আমার পানে ও'তাকাল। তার গভীর বিশ্বাসভরা দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, আমার কাছে সে এমন কিছু বলতে চায় যা তার অন্তরকে অহরহ পীড়িত করছে। 'আবার সে ঘড়িটার পানে তাকাল। রাত একটা ট৬ করে ঘড়ি বেজে উঠল।

"ঠিক এই সময়ে," যুবকটি হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠল, "আজ থেকে চার মাস আগে ..."

যুবকটি বলতে শুরু করে, শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে পড়ি— চোখের সামনে আমার ভেসে ওঠে নিকষ কালো অন্ধকার রাত্রি, বরফে ঢাকা দুর্গম উপত্যকা, বীচ আর ঝাউগাছে ভরা তুষারমণ্ডিত পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঝড়ের উন্মত্ত দাপাদাপি আর সব শেষে কামানের গোলায় বিধ্বস্ত একখানি গ্রাম আর সেই গ্রামের মাঝে হতাবশিষ্ট এক দল সার্বিয়ান সৈন্য।

সৈনিকদের মুখ শুষ্ক মলিন। ধীর পদবিক্ষেপে তারা পশ্চাদপসরণ করছে আড্রিয়াটিক সাগরের দিকে।

এই বিপর্যস্ত বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে যে ক্ষুদ্র সেনাদল ছিল আমার বন্ধুটিই ছিল তার অধিনায়ক। একসময় এরা ছিল সুশৃঙ্খল যোদ্ধবাহিনী, এখন নেমে গেছে উচ্ছৃঙ্খল জনতার পর্যায়ে। সৈনিকদের সঙ্গে চলেছে ত্রস্ত কৃষকের দল। নিদারুণ কষ্টে ও ভয়ে তারা এমনই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে তারা চলেছে অবিকল যন্ত্রের মতো। পশুর দলকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, এদেরও তেমনি তাড়না করতে হচ্ছে।

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে, তাদেরই মধ্যে যারা আবার সাহসী ও বলিষ্ঠ তাদের চোখে জল নেই। নীরবে পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে তারা মৃত সৈনিকদের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ছে তাদের বন্দুক আর টোটাভরা বেল্ট সরিয়ে নেবার জন্য।

অদূরে গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাঝে মাঝে শেল বিদীর্ণ হয়ে রক্তবর্ণ আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক আলোকিত করছে। সঙ্গে সঙ্গে

কামানের গর্জনও শোনা যাচ্ছে—কামানের গোউলা জ্বলন্ত স্কার মতো বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে চলেছে। বন্দুকের গুলির অবিরাম গুঞ্জনে আকাশ বাতাস যেন মুখর।

প্রভাতের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হবে। কারা যে তাদের আক্রমণ করবার জন্য অন্ধকারে সমবেত হয়েছে তা তারা জানে না। ওরা জার্মান, না অস্ট্রিয়ান, না বুলগেরিয়ান, না তুর্কী? শত্রু তাদের অনেক- কে জানে কারা এসে হানা দিয়েছে।

"আমাদের পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না," সার্ব বন্ধুটি বলতে লাগল, "ভোর হবার আগেই যেমন করে হোক পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নিতে হবে। যারা আমাদের সঙ্গে যেতে অক্ষম তাদের ফেলে আমরা যাত্রা শুরু করলাম।"

স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ সব সারি বেঁধে চলেছে ভারবাহী পশুদের সঙ্গে। চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাদের দেখা যায় না শুধু সুস্থ বলিষ্ঠ লোকেরাই তখনও গ্রাম ছেড়ে বেরোয়নি আশ্রয়-স্থান থেকে শত্রুদের দিকে তারা মধ্যে মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ চালানো সম্ভব মনে হল না। তারাও ক্রমশ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সরে আসতে লাগল। হঠাৎ কী মনে পড়ায় ক্যাপটেন সচকিত হয়ে উঠলেন "আহতদের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায়?"

কিছুদূরে এক খামার-বাড়ির মধ্যে জন পঞ্চাশেক আহত নরনারী খড়ের উপর শুয়ে যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছে। এদের মধ্যে কয়েক জন আহত হয়েছে দিন কয়েক আগে, তবে আঘাত খুব মারাত্মক হয়নি বলে আহত দেহটাকে কোনরকমে টেনে এনেছে ঐ খামার-বাড়ি পর্যন্ত। জন কয়েক আহত হয়েছে সেই রাত্রেই, যন্ত্রণায় তারা অর্ধঅচেতন, আর স্ত্রীলোক যারা রয়েছে তারা আহত হয়েছে শেলের বিক্ষিপ্ত টুকরায়।

ক্যাপটেন গম্ভীরমুখে খামার-বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ঘরখানা শুক্‌নো রক্ত ও পচা মাংসের দুর্গন্ধে ভরা। ক্যাপটেনের গলা শুনেই

লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোয় সকলেই অস্থিরভাবে নড়ে উঠল।···কাতরানি থেমে গেছে। বিস্ময় ও আতঙ্কে সকলেই নিস্তব্ধ। মনে হল যেন ঐ মুমূর্ষু হতভাগ্যের দল মরণের চেয়েও ভয়াবহ আর কিছুর সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রক্ষিসৈন্য তাদের ত্যাগ করে চলে যাবে শুনে সকলেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু বেশীর ভাগই আবার মেঝের উপর শুয়ে পড়ল।

ক্যাপটেন ও তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে আহতদের দল ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগল, "ভাইগণ, তোমরা আমাদের ফেলে যেয়ো না-যীশুর দোহাই—"

তারপর তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, সৈনিকেরা নিরুপায়, এখনই ওদের যাত্রা শুরু করতে হবে। বুঝে তারা নিরস্ত হল--অদৃষ্টের নির্মম বিধান স্বীকার করে নেবার জন্য মনকে দৃঢ় করল।···কিন্তু শত্রুর কবলে পড়া! চিরশত্রু বুলগেরিয়ান বা তুর্কীর অনুগ্রহে বেঁচে থাকা! মুখে তারা যা ব্যক্ত করতে পারল না, চোখের নীরব ভাষায় তা ফুটে উঠল। সার্বের পক্ষে বন্দী হওয়া মরণাধিক যন্ত্রণা! মৃত্যুপথযাত্রী অনেকেই স্বাধীনতা হারাবার চিন্তায় আতঙ্কে শিউরে উঠল।

বলকানদের প্রতিহিংসা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

"ভাই- বন্ধু--"

ওদের কাতর আবেদনের অন্তরালে যে আকাঙ্ক্ষা লুকানো ছিল ক্যাপটেন তা বুঝতে পেরে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

"তোমরা কি চাও আমিই---"

এক মুহূর্ত পরে প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

সকলেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ওদের ছেড়ে যাওয়া যখন একান্ত দরকার, তখন যাবার আগে একজন সার্বকেও জীবিত রেখে যাওয়া উচিত হবে না তাঁর। তিনি নিজে যদি ঐ অবস্থায় পড়তেন তাহলে তিনিও কি ওদের মতো ঐ প্রার্থনা জানাতেন না?

পলায়নের ব্যস্ততায় সৈনিকেরা কেউই বেশী টোটা সংগ্রহ করতে

পারেনি ; সঙ্গে যা আছে তা ভবিষ্যতের সঞ্চয়। ক্যাপটেন তরবারি কোষমুক্ত করলেন। জন কতক সৈনিক ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে সঙ্গীনের সাহায্যে, তবে তাদের কাজ নিতান্ত এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল— যেখানে খুশী সঙ্গীনের খোঁচা মারছে, আহত ছটফট করছে অব্যক্ত যাতনায়, রক্তের ধারা ছুটছে ফোয়ারার মতো। আহতেরা সবাই প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে আসছে ক্যাপটেনের দিকে। সাধারণ সৈনিকের হাতে মরার চেয়ে ক্যাপটেনের হাতে মরাই ভালো, তাতে সম্মানও আছে, যাতনাও অপেক্ষাকৃত কম।

"আমায় নাও, ভাই·· আমায় নাও—" আর্তকণ্ঠে একজন মিনতি করল।

তরবারির একটি নিপুণ আঘাতে মুহূর্তে ক্যাপটেন তার কণ্ঠদেশের একটি শিরা কেটে ফেললেন, সঙ্গে-সঙ্গে তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হামাগুড়ি দিয়ে একে একে আসতে লাগল ওরা— ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে কতকগুলো সরীসৃপ যেন এগিয়ে আসে। ক্যাপটেনের পায়ের কাছে ওরা ভীড় জমাতে থাকে। প্রথমটা ক্যাপটেন মুখ ফিরিয়ে নেন, ঐ বীভৎস অনুষ্ঠান তিনি দেখতে চান না, চোখ তাঁর জলে ভরে ওঠে। কিন্তু এই দুর্বলতার ফলে মন তাঁর একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আগের মতো নিপুণভাবে আঘাত হানতে পারেন না, বার বার আঘাত করতে হয়, আহতের যাতনা হয় দীর্ঘায়িত। ক্যাপটেন বোঝেন, সংযত হওয়া তাঁর দরকার -মনে মনে বলেন, "দুবল হলে চলবে না—হাত স্থির রাখতে হবে! হাত স্থির রাখতে হবে!"

"বন্ধু, এবার আমায় নাও·· এবার আমায়·· "

মরণের প্রতিযোগিতা চলেছে - সবাই চায় মরতে—কে জানে এই মৃত্যুযজ্ঞ শেষ হবার আগেই শত্রুরা যদি এসে পড়ে! কীভাবে বসা দরকার তা ওরা এরই মধ্যে যেন শিখে নিয়েছে। প্রত্যেকেই মাথাটা একপাশে কাৎ করে বসেছে যাতে ঘাড়টা শক্ত হয়ে ওঠে আর শিরাটা চোখে পড়ে সহজেই।

"আমায় নাও ভাই—আমায় নাও···' ব্যাকুল প্রার্থনা জানায় আরেকজন। তরবারির শাণিত ফলাটা এগিয়ে আসে, সঙ্গে-সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ে পাশের মৃতদেহগুলির উপর।

*　　　*　　　*

হোটেল খালি হয়ে আসে। সৈনিকদের বাহুবন্ধনে সুবেশা তরুণীর দল ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হয় সুবাসের হিল্লোল তুলে। তরল হাস্যধ্বনির মধ্যে ইংরেজ সৈনিকদের বেহালা নীরব হয়ে গেছে।

সার্ব যুবকটির হাতে সাদা রঙের ছোট একখানা ছুরি। ছুরিখানা তুলে ধরে আপনমনে সে টেবিলের উপর বারংবার আঘাত করে আর অস্ফুটস্বরে বলতে থাকে, "ট্যাক্···ট্যাক্···"

তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন স্মৃতির পীড়নে অন্তর তার নিষ্পেষিত হচ্ছে।

স্বপ্ন

উইলিয়াম সমারসেট মম বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী কথাশিল্পীদের অন্যতম। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষালাভ করেন। এখানে কিছুকাল অধ্যয়নের পর সেণ্ট টমাস হসপিট্যাল থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী পান, কিন্তু চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেননি। এঁর ধারণা ছিল, লেখকের পক্ষে দুটি জিনিস একান্ত আবশ্যক—চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞান ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইনি ইংলণ্ডের গুপ্তচর বিভাগে কাজ করেন এবং ঐ উপলক্ষে নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। এঁর লেখা উপন্যাস ও নাটক অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত Of Human Bondage, The Moon and Sixpence ও Cakes and Ale। নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Our Betters ও The Circle। ছোটগল্প রচনা শুরু করেন অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। ছোট-গল্পেও এঁর দক্ষতা অসাধারণ মানবচরিত্রের সুনিপুণ বিশ্লেষণের গুণে এঁর প্রতিটি গল্পই অপূর্ব।

১৯১৭ সালের আগস্ট মাস। আমি তখন এমন এক কাজে নিযুক্ত ছিলাম যা আমায় বাধ্য করেছিল নিউ ইয়র্ক থেকে পেট্রোগ্রাড যাত্রা করতে। পাছে পথে আমার কোন বিপদ ঘটে এ আশঙ্কায় আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন ভ্লাডিভস্টক্ দিয়ে আমি গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হই। ভ্লাডিভস্টক্-এ পৌঁছলাম সকালবেলা। হাতে কোন কাজ ছিল না, সারাটা দিন কাটালাম এধার ওধার ঘুরে। ট্রান্সসাইবেরিয়ান ট্রেনের ছাড়ার কথা রাত ন'টায়। খাওয়াটা সেরে নিতে স্টেশন-সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম। রেস্তোরাঁয় বেজায় ভিড়। আমি যে ছোট টেবিলটির ধারে বসলাম তার অপর দিকে যে লোকটি বসেছিল তার চেহারাটা বিশেষ আকৃষ্ট করল আমায়। সে যে রাশিয়ান তা সহজেই বোঝা যায়। যেমন লম্বা তেমনি মোটাসোটা।

ভুঁড়িটা তার এমনি বিরাট যে টেবিলের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে বসতে হয়েছিল তাকে। তার হাত তুটো শরীরের তুলনায় ছোট এবং চর্বির প্রাচুর্যে অতিশয় স্থূল। মাথায় কালো লম্বা চুল, পাতলা—তবে এমনভাবে আঁচড়ানো যে মাঝখানের টাকটা ঢাকা পড়ে গেছে কতকটা। তার দাড়িগোঁফ-কামানো মেদবহুল পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে যেন এক অশোভন নগ্নতার আভাস। নাকটা আকারে ছোট- -যেন ক্ষুদ্র একটি বোতাম কেউ বসিয়ে দিয়েছে মুখের ঐ বিরাট মাংসস্তূপের উপর। তার কালো জ্বলজ্বলে চোখতুটোও নিতান্ত ছোট। কিন্তু তার হাঁ-মুখটা খুব বড় এবং লালচে আভাযুক্ত—যা দেখে মনে হয় লোকটি অত্যন্ত ভোগাসক্ত। গায়ে কালো রঙের একটা স্যুট। স্যুটটা পুরোনো বা জীর্ণ নয়, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন। গায়ে ওঠার পর থেকে ওটাকে যে কোনদিনই পরিষ্কার করা হয়নি এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

রেস্তোরাঁয় আহার্য পরিবেশনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একরকম অসম্ভব। চুপচাপ আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের তুজনের কথাবার্তা শুরু হ'ল। রাশিয়ানটি বেশ স্বচ্ছন্দে কথা কইতে লাগল শুদ্ধ ইংরেজীতে যার তার উচ্চারণভঙ্গী একেবারে ত্রুটিহীন না হলেও নিতান্ত শ্রুতিকটু নয়। আমাকে সে নানান্ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করল আমার কাজকর্ম সম্পর্কে, কিন্তু আমি যে কাজে এখানে এসেছি সেটা প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না বলে আন্তরিকতার ভান ক'রে এমনভাবে তার প্রশ্নগুলির জবাব দিতে লাগলাম যাতে সে সন্দেহ করতে না পারে যে আমি প্রকৃত তথ্য গোপন করছি। তাকে বললাম, সাংবাদিকতা আমার পেশা। সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, উপন্যাস লিখি কিনা এবং যখন বললাম অবসর সময়ে মাঝে মাঝে লিখি, তখন সে বলতে শুরু করল সমসাময়িক রুশ ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিতান্ত সামান্য নয় এবং সে যে শিক্ষিত এটা বুঝতে দেরি হ'ল না।

এতক্ষণে ওয়েটার আমাদের তুজনকে খানিকটা ক'রে কপির স্যুপ দিয়ে গেল অনেক সাধ্যসাধনার পর। আমার নতুন বন্ধুটি পকেট

থেকে এক বোতল ভড কা বেব করে পানেব আমন্ত্রণ জানাল আমাকে। *মদ্যপান করার ফলে কি রুশ জাতির স্বাভাবিক প্রগলভতার দরুন তা* ঠিক জানি না, লোকটা খানিক পবেই অনর্গল কথা বলতে শুরু কবল এবং আমি জানতে না চাইলেও অনেক কথাই আমাকে বলল নিজেব সম্বন্ধে। অভিজাত বংশে ওব জন্ম, পেশা ওকালতি এবং বাজনীতিক্ষেত্রে সংস্কাবপন্থী। সবকাবী কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে কোন ব্যাপারে বিরোধ হওয়ায় কিছুকাল বিদেশে থাকতে বাধ্য হয়েছিল সে, এখন বাড়ি ফেরাব পথে। বিশেষ একটা জরুবী কাজে ভ্লাডিভস্টক্-এ আটকে গেছে, কিন্তু এক সপ্তাহেব মধ্যেই রওনা হবে মস্কৌ। আমি যদি ওখানে যাই, আমাব সঙ্গে দেখা হলে খুশী হবে সে।

'আপনি কি বিবাহিত?' আমাকে জিজ্ঞাসা কবল সে।

প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হলাম মনে মনে, কিন্তু বললাম যে আমি বিবাহিত। রাশিয়ান একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'আমি বিপত্নীক,' লোকটি বলতে থাকে, 'আমাব স্ত্রী ছিল সুইটজাবল্যাণ্ডেব মেয়ে, জেনেভাব বাসিন্দা। পড়াশুনা সে করেছিল বিস্তব - ইংরেজী, জার্মান ও ইতালিয়ান চমৎকাব বলতে পাবত সে ফরাসী ছিল তাব মাতৃভাষা। রুশ ভাষাও সে জানত সাধারণ বিদেশীর চাইতে অনেক ভাল। রুশ ভাষায় যখন সে কথা কইত, তখন তাব উচ্চাবণেব মধ্যে কোনবকম আড়ষ্টতা থাকত না।'

সুমুখ দিয়ে একজন ওয়েটাব যাচ্ছিল ট্রে-ব উপব কতকগুলি ডিস নিয়ে। আমাব সঙ্গীটি তাকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞাসা কবল। আমি তখন রুশ ভাষা জানতাম না মোটেই, তবে মনে হ'ল সে জানতে চাইল পববর্তী ডিসেব জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা কবতে হবে আমাদেব। তাড়াতাড়ি আশ্বাসসূচক কি একটা বলে ওয়েটাব চলে গেল ব্যস্তভাবে এবং আমাব বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবলেন সেইদিকে চেয়ে।

'বিপ্লবের পব থেকে রেস্তোরাঁব খাদ্য পবিবেশনেব ব্যবস্থা জঘন্য হয়ে পড়েছে', মন্তব্য করল সে।

পর পর কয়েকটি সিগারেট ভস্মীভূত ক'রে এবার সে ধরাল

আরেকটি এবং হাতঘড়ির দিকে চেয়ে আমি ভাবতে লাগলাম ট্রেন ধরবার আগে আহারপর্বটা শেষ করতে পারব কিনা।

'আমার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত গুণবতী,' রাশিয়ান সঙ্গীটি আবার বলতে শুরু করে, 'পেট্রোগ্রাডে সম্ভ্রান্ত সমাজের মেয়েদের জন্য যে স্কুল আছে, সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করত সে। তবে সে ছিল অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমার প্রতি তার ভালবাসাটা ছিল অত্যন্ত উগ্র রকমের।'

. নিঃশব্দে ওর কথাগুলো শুনে যাওয়া আমার পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠল। এরকম কুরুচিসম্পন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি জীবনে। আমোদপ্রিয় মোটা মানুষের সঙ্গ অনেক সময় ভালো লাগে, কিন্তু এই হাস্যপরিহাসবিমুখ বিকৃতরুচি স্থূলকায় মানুষটিকে বরদাস্ত করা শক্ত হয়ে পড়ল।

'একথা আমি বলতে চাই না যে স্ত্রীর প্রতি আমি একনিষ্ঠ ছিলাম। সে ছিল খর্বাকৃতি ও ক্ষীণ এবং তার দেহে লাবণ্য ছিল না এতটুকু। প্রায়ই সে ঝগড়া কবত আমার সঙ্গে। ঈর্ষায় বিষাক্ত ছিল তার মনটা এবং কোন মেয়ের প্রতি পাছে আমি আকৃষ্ট হই এই ভয়ে সে সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত। সে যে শুধু আমার পরিচিত মেয়েদের সম্বন্ধেই ঈর্ষান্বিত ছিল তা নয়, সে আমার বন্ধু, আমার বেড়াল এবং আমার বইগুলিকে পর্যন্ত ঈর্ষার চোখে দেখত। একবার আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার একটা কোটই দান করে দিল একজনকে, যেহেতু আমি সেই কোটটাকে পছন্দ করতাম অন্য সব কোটের চাইতে বেশি। আমার মেজাজটা চিরদিনই শান্ত গোছের, সহজে বিচলিত হই না আমি। স্ত্রীর ব্যবহারটা যে আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল এ আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তার ঐ বিশ্রী মেজাজটাকে ভগবানের বিধান বলেই আমি মেনে নিয়েছিলাম এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা কখনও জাগত না মনে, যেমন কেউ বিদ্রোহ করতে চায় না খারাপ আবহাওয়া বা ঠাণ্ডা লাগার দরুন মাথাধরার বিরুদ্ধে।

যতদিন সম্ভব হয়েছিল, তার অভিযোগ অস্বীকার করতাম আমি,

কিন্তু যখন তা আর সম্ভব হল না তখন শুধু কাঁধটা একটু নেড়ে সিগারেট টানতাম নির্বিকারভাবে।

নিজের খুশিমত চলতাম আমি—যা আমার ভালো লাগে করতাম তাই। মাঝে মাঝে ধাঁধায় পড়ে যেতাম, বুঝতে পারতাম না আমার প্রতি স্ত্রীর মনোভাবটা কী—তীব্র অনুরাগ, না তীব্র ঘৃণা? আমার মনে হ'ত, ভালবাসা আর ঘৃণা পরস্পরের কাছাকাছি।

এইভাবে আমাদের জীবনটা চলে যেত আরও অনেকদিন যদি না হঠাৎ একদিন রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটত। স্ত্রীর আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সন্ত্রস্তভাবে উঠে বসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কী। সে বলল, এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছে সে। সে স্বপ্নে দেখেছে, আমি নাকি হত্যা করবার চেষ্টা করছিলাম তাকে। আমরা একটি বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় থাকতাম। যে-জায়গাটি আশ্রয় ক'রে সিঁড়ি উঠেছিল সেটা বেশ প্রশস্ত। সে স্বপ্ন দেখেছে, আমরা যেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে পৌঁছেছি অমনি আমি তাকে ধরে রেলিঙের বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছি জোর ক'রে। বাড়িটা ছ'তলা, সিঁড়িব নীচে মেঝেটা পাথর দিয়ে বাঁধানো, পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল সে—উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছিল থর থর করে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম তাকে শান্ত করতে। কিন্তু পরের দিন সকালে এবং তারপর আরও দু'তিন দিন সে আবার ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করল এবং যদিও আমি ওটা হেসে উড়িয়ে দিলাম, সে যে ওটা মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারছে না এটা বেশ লক্ষ্য করলাম। আমিও ঐ সম্পর্কে মনটাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারলাম না, কারণ ঐ স্বপ্নটি এমন একটি তথ্য উদ্‌ঘাটিত করল আমার কাছে, যা আমি কোনদিনই সন্দেহ করিনি। তার ধারণা হয়েছে আমি ঘৃণা করি তাকে, সে ভাবতে শুরু করেছে তার হাত থেকে মুক্তি পেলে খুশি হব আমি। তাকে যে আমি বরদাস্ত করতে পারি না এ সে জানত এবং একসময় হয়তো এ চিন্তাটাও তার মাথায় এসে থাকবে যে ওকে হত্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

মানুষের চিন্তা কখন কোন্ পথে ধাবিত হয় তা বলা যায় না এবং এমন অনেক চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে আসে যা স্বীকার করতে আমরা লজ্জাবোধ করব। কখনও ভেবেছি, ও যদি কোন প্রণয়ীর সঙ্গে উধাও হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারি, কখনও বা মনে হয়েছে হঠাৎ যদি যন্ত্রণাহীন মৃত্যু এসে হাজির হয় তাহলে মুক্তি পাই এ অশান্তি থেকে, কিন্তু এ চিন্তা আমার মনে কখনও জাগে নি যে আমি নিজেই তৎপর হয়ে ঐ দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করব নিজেকে।

ঐ স্বপ্নটা আমাদের দুজনেরই মনের উপর ক্রিয়া করতে লাগল বিভিন্নভাবে। আমার স্ত্রী রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং ওর উগ্রতাও একটু স্তিমিত হয়ে এল যেন। কিন্তু যখনই আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসতাম, তখনই রেলিঙের ধারে গিয়ে নীচের দিকে একবার না তাকিয়ে পারতাম না। মনে হত ও যা স্বপ্নে দেখেছে সেটা সম্পন্ন করা কতই না সহজ। রেলিঙ অত্যন্ত নীচু। সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই কাজ হাসিল।

মনের মধ্যে ঐ চিন্তাটা কেবলই পাক খেতে লাগল, তাড়িয়ে দিতে পারলাম না কিছুতেই।

মাস কয়েক পরে, আমার স্ত্রী একদিন রাত্রে আমায় জাগাল ঘুম থেকে। আমি তখন অত্যন্ত শ্রান্ত, ঘুম ভাঙানোর জন্য ভারী রাগ হল স্ত্রীর উপর। স্ত্রী ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে, তার সারা দেহ থরথরিয়ে কাঁপছে। আবার ঐ স্বপ্ন দেখেছে সে। ভয়ে কেঁদে ফেলল সে এবং আমি ওকে ঘৃণা করি কিনা জিজ্ঞাসা করল কম্পিত-কণ্ঠে। রাশিয়ান ক্যালেণ্ডারের সমস্ত সাধুসন্তদের নামে আমি শপথ করে বললাম, আমি ওকে ভালবাসি। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্ত্রীকে শান্ত করার জন্য যেটুকু করলাম তার বেশি কিছু করবার শক্তি ছিল না আমার। চোখে ঘুম এল না, শুয়ে রইলাম জেগে। মনে হল যেন একটি ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। দেখলাম, উপরতলা থেকে স্ত্রী পড়ছে সিঁড়ির রেলিঙের পাশ দিয়ে। তার দুই চোখ ভয়ে বিস্ফারিত, মুখ অসম্ভব

ক্যাকাশে। তার ভয়ার্ত করুণ চীৎকার শুনতে পেলাম। তার দেহটা যখন এসে ধপ্ করে পড়ল পাথরের মেঝের উপর, তখন সেই ভারী শব্দটাও কানে এল যেন। শিউরে উঠলাম আমি।

বলতে বলতে সে থেমে গেল হঠাৎ এবং তার কপালে বড় বড় স্বেদবিন্দু দেখা দিল। গল্পটা সে বলেছে অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে এবং আমিও শুনেছি মনোযোগ দিয়ে। বোতলে তখনও খানিকটা ভড্‌কা ছিল, গ্লাসে ঢেলে নিয়ে ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলল সে।

'আপনার স্ত্রী শেষটা মারা গেলেন কিভাবে?' একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলাম।

পকেট থেকে ময়লা একখানা রুমাল বের করে কপালটা সে মুছে নিল।

'স্বপ্নের সঙ্গে ঘটনার আশ্চর্য মিল! একদিন গভীর রাত্রে দেখা গেল সিঁড়ির নীচে সে পড়ে রয়েছে – ঘাড়টা ভাঙা।'

'কে তাকে ঐ অবস্থায় দেখল?'

'ঐ বাড়িরই একজন ভাড়াটে। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ওখানে এসেছিল সে।'

'আপনি কোথায় ছিলেন?'

লোকটার চোখে এমন একটা বিদ্বেষপূর্ণ চাতুর্য প্রকট হয়ে পড়ল যে তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তার ছোট কালো চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

'আমি সে রাতটা ছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। বাড়ি ফিরি দুর্ঘটনার এক ঘণ্টা পরে।'

ঠিক সেইসময় ওয়েটার মাংসের ডিস এনে হাজির করল এবং আমার রাশিয়ান সঙ্গীটি খেতে আরম্ভ করল পরম আগ্রহে। এক একটি গ্রাসে অনেকখানি মাংস তুলে নিয়ে মুখের ভেতর পুরতে লাগল সে।

আমি কেমন হতভম্ব হয়ে পড়লাম। সে যে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে এই কথাটাই কি সে এতক্ষণ বলছিল গোপনতার সামান্য একটু

আবরণ রেখে? ঐ মোটা জরদগব লোকটাকে খুনী বলে মনে হয় না তো? কাউকে খুন করবার মত সাহস ওর হবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে কি লোকটা রসিকতা করল আমার সঙ্গে?

ট্রেন ছাড়ার আর বেশি দেরি ছিল না। বেরিয়ে এলাম রেস্তোরাঁ থেকে। লোকটা তখনও গোগ্রাসে খাচ্ছে। এর পর মস্কো বা অন্য কোথাও ওকে আর দেখতে পাই নি। কিন্তু আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না ও যা বলেছিল তা সত্য, না সবটাই নিছক কৌতুকমাত্র।*

*Cosmopolitan পত্রিকায় প্রকাশিত সমারসেট মম এর সত্যঘটনামূলক গল্প অবলম্বনে।

অকাট্য প্রমাণ

১৮৯০ সালে বোহেমিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কারেল চাপেক। পিতা ছিলেন চিকিৎসক। প্রাগ্-এ ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যরচনায় ব্রতী হন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন তাঁর ভ্রাতা যোসেফ। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন একান্তভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও প্রযোজনায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও ছোটগল্প রচনাতেও তার দক্ষতা অসাধারণ। মানবচিত্তের নিগূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণে তার প্রতিটি গল্পই অপূর্ব। বক্ষ্যমাণ গল্পে তার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম প্রেসিডেণ্ট মাসারিক ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে R. U. R., The Life of the Insects ও The Power and the Glory সমধিক প্রসিদ্ধ।

"দেখো টোনিক, এ হল নিছক অভিজ্ঞতার ব্যাপার।" পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট মেটস্ বললেন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে উদ্দেশ করে, "কোনরকম ছল-ছুতো বা কৈফিয়তে বিশ্বাস করি না আমি—আসামী বা সাক্ষী কারো কথায় কোনদিন আস্থা স্থাপন করি না। সব মানুষই মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বলার ইচ্ছে না থাকলেও মিথ্যাকে এড়াতে পারে না কিছুতেই। সাক্ষী হয়তো হলফ করে বলছে, আসামীর বিরুদ্ধে তার কোন শত্রুভাব ভাব নেই অথচ সে জানে না যে তার মনের নিগূঢ় প্রদেশে অর্থাৎ কিনা অবচেতন মনে সে তার অনিষ্ট কামনা করছে নিরুদ্ধ ঘৃণা বা ঈর্ষার বশে। আসামী যা বলে সবই অসত্য এবং পূর্বাহ্ণে তৈরী করা, আর সাক্ষী যা বলে তার পশ্চাতে রয়েছে আসামীকে সাহায্য করার অথবা বিপন্ন করার সজ্ঞান কিংবা নির্জ্ঞান ইচ্ছা। সাধারণ লোকের কাছে এ সমস্ত তথ্য অজানা থাকলেও আমার কাছে একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। মানুষ একান্ত ভণ্ড ও

অসাধু—সততাকে সে চিরদিন পরিহার করেই চলে। তুমি হয়তো বলবে, তাই যদি হয়, তবে অপরাধীকে ধরবার উপায় কী? তার একমাত্র উপায় হচ্ছে দৈবের উপর নির্ভর করা অর্থাৎ কিনা মানুষ অজান্তে যে-সব কাজ করে বা অসাবধানে যে-সব কথা বলে ফেলে—যা রোধ করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব—সেদিকে বিশেষ নজর রাখা। সবই ভণ্ডামির আবরণে ঢাকা দেওয়া যেতে পারে, সবই অবশ্য ভুয়ো কিংবা কোনো গোপন উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত, কিন্তু দৈব সম্বন্ধে ও কথা বলা চলে না। ··আমার পদ্ধতি হচ্ছে এই: আমি বসে থাকি চুপ-চাপ, যে যা বলবে বলে তৈরী হয়ে এসেছে, বলতে দিই তাকে, তাদের কথা যে আমি বিশ্বাস করছি এমনি ভান করতে থাকি, বস্তুতঃ তাদের আমি উৎসাহই দিই বলবার জন্য যাতে তারা নিজেদের বক্তব্য সাড়ম্বরে জানাতে কুণ্ঠাবোধ না করে, তার পর আমি ওৎ পেতে থাকি সুবিধা-মতো ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য অর্থাৎ কিনা অপেক্ষা করি কখন ওদের মুখ দিয়ে ফস্ করে এমন একটা কথা বেরিয়ে পড়বে যা বলা ওদের অভিপ্রেত নয়। অবশ্য এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তোমাকে মনস্তত্ত্ববিদ্ হতে হবে। কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের রীতি হচ্ছে অন্যরকম। তাঁরা গোড়া থেকেই চেষ্টা করেন আসামীকে ঘাবড়ে দিতে—আসামী যখন দাঁড়ায় জবানবন্দী দিতে, অমনি তাঁরা অজস্র প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করে তোলেন এবং এমন বেকায়দায় তাকে ফেলে দেন যে বেচারা শেষ পর্যন্ত স্বীকার না করে পারে না যে, সে—ধরা গিয়ে—সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের হত্যাকারী। আমি চাই নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একেবারে নির্ভুল হতে, তাই আমি সহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করি যতক্ষণ না আসামীর সুসংবদ্ধ মিথ্যা ভাষণের মধ্যে সত্যের একটুখানি আলো ঝলসে ওঠে। দেখো, এই ধাপ্পাবাজি-ভরা দুনিয়ায় সত্যের নাগাল পাওয়া একরকম অসম্ভব, যদি না অপরাধী অসতর্ক মুহূর্তে ধরা দেয় তার কাজে বা কথায়।

"দেখো টৌনিক, আজ পর্যন্ত তোমার কাছে কিছুই গোপন করিনি আমি। ছোটবেলা থেকেই আমরা বন্ধু আর সে বন্ধুত্ব আজও

সেই আগেকার মতো গভীর ও অকৃত্রিম। মনে পড়ে একবার জানলার কাচ ভেঙেছিলাম আমি আর আমার অপরাধে শাস্তি পেয়েছিলে তুমি? …কথাটা আমার প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয় না বটে, কিন্তু নিজের আচরণে আমি এত লজ্জিত যে প্রকাশ না করেও স্বস্তি পাচ্ছি না… মনে হচ্ছে কথাটা বলে ফেলতে পারলে যেন একটা বোঝা নেমে যায় বুক থেকে। সত্যি, কোন কিছুই বেশিদিন গোপন করা চলে না—গোপন করার চেষ্টা শুধু যাতনা বাড়ায়। আমি যে পদ্ধতির কথা এইমাত্র বললাম, সেটা যে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে সে কথা বলতে চাই তোমাকে। সবটা শুনে তুমি অবশ্য আমায় বলবে—বলাটা খুবই স্বাভাবিক—যে আমি নিতান্ত আহাম্মক ও বেয়াদব। আর সত্যি বলতে কি, এ ক্ষেত্রে তিরস্কারটা আমার প্রাপ্য।

"দেখো বন্ধু, আমি আমার স্ত্রী মার্থাকে সন্দেহ করেছিলাম। বলতে কি, ঈর্ষায় একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম আমি। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, মার্থা গোপনে প্রেম করেছে ঐ ছোকরাটার সঙ্গে—কি নামটা যেন ওর…ঐ…ঐ…ধরো আর্থাবের সঙ্গে। আমার মনে হয়, ওকে তুমি চেনো--নামটা না বললেও কিছু অসুবিধা হবে না। আমি অবশ্য অবুঝ নই…আমি যদি নিঃসংশয়ে জানতাম মার্থা ভালোবাসে তাকে, আমি রাগ না করে বলতাম, 'মার্থা, তোমার যা ভালো লাগে তাই করো, আমি বাধা দিতে চাই না।' কিন্তু মুশকিল এই যে, ব্যাপারটা সঠিক জানতে পারিনি…টোনিক, এই সংশয়টা যে কী বেদনাদায়ক তা তোমার ধারণা নেই। বলতে কি, একটা বছর আমার কেটেছে যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে।…সন্দিগ্ধ স্বামী সচরাচর যে-সব বেয়াড়া কৌশল অবলম্বন করে তা তোমার নিশ্চয়ই অজানা নয় …স্ত্রীর গতিবিধি সে লক্ষ্য করে অলক্ষ্যে, চাকর-বাকরদের প্রশ্ন করে হয়রান করে তোলে, কখনও বা প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করে অনর্থক চেঁচামেচি করে। তাছাড়া এটাও ভুললে চলবে না যে, আমি আবার ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট, সওয়াল করাটা আমার একরকম মজ্জাগত

হয়ে গেছে। বিশ্বাস করো বন্ধু, গত বছরটা আমার পারিবারিক জীবনের সবটাই কেটেছে একটানা সওয়াল-জবাবের মধ্যে···সব সময়ই সওয়াল চলেছে পুরোদমে, সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে শোবার সময় পর্যন্ত।

"আসামী অর্থাৎ কিনা আমার স্ত্রী মার্থা--তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে শুনে—আমার এই বেপরোয়া সওয়ালে ঘাবড়ায়নি এতটুকু। কখনও সে কেঁদে ফেলেছে অভিমানে, কখনও রাগ করে জবাব দেয়নি আমার কথার, আবার কখনও বা দীর্ঘ কৈফিয়ত দিয়েছে সারাদিন বাড়ি ছিল না বলে, কিন্তু যখনই সে কথা কয়েছে, সে বেশ সাবধানেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, তার কথার মধ্যে এমন কোনো গলদ ধরা পড়েনি যাতে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য অনেক সময় সে মিথ্যে কথা বলতো···মিথ্যে না বলেই বা করে কি···ওটা হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব। কোনো মেয়েই তোমায় সোজাসুজি বলবে না, দু'ঘণ্টা সে ছিল দর্জির দোকানে পোশাকের অর্ডার দিতে গিয়ে—মিথ্যে সে বানাবেই— বলবে, সে গিয়েছিল ডেন্টিস্টের কাছে কিংবা গোরস্থানে মায়ের কবরটা একবার দেখে আসতে। যতই আমি জেরা করে মার্থাকে অস্থির করে তুলতাম —জানোই তো সন্দিগ্ধ স্বামী ক্ষিপ্ত কুকুরের চেয়েও মারাত্মক--যতই তাকে কাবু করবার চেষ্টা করতাম তর্জন-গর্জন করে, ততই আমি যেন চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলতাম। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অছিলা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার মধ্যে আমি পূর্ব-পরিকল্পিত অর্ধসত্য ও অর্ধ-মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারতাম না। ঐ সব ছলনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, কারণ মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক, বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যে ঐগুলোকেই অবলম্বন করে গড়ে ওঠে এ অস্বীকার করবার উপায় নেই।···আমার যে কী দুর্ভোগ গেছে তা আমি জানি, কিন্তু যখন ভাবি বেচারী মার্থা ভুগেছে আমার চেয়ে বহুগুণ বেশি তখন···তখন আত্মগ্লানিতে মুষড়ে পড়ে মনটা।

"এ বছর মার্থা গিয়েছিল ফ্রাঙ্কেন্সবাড্-এ হাওয়া বদল করতে। জানোই তো মেয়েদের অসুখ লেগেই থাকে বারো মাস, শরীর ভালো আছে এ কথা কখনও শুনবে না ওদের মুখে···তবে হ্যাঁ, সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য, ইদানীং মার্থার স্বাস্থ্যের জৌলুসটা একটু যেন কমে গিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, ওখানেও যাতে ওর গতিবিধি সতর্কভাবে লক্ষ্য করা হয় সে-ব্যবস্থা করতে ভুলিনি আমি। টাকা দিয়ে একজন লোক রেখেছিলাম ঐ কাজটি করবার জন্যে, সে অবশ্য বিশেষ কিছুই করেনি, শুধু বারকতক মার্থার হোটেলের সামনে ঘোরাঘুরি করেই কর্তব্য শেষ করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে যদি সামান্য এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য এসে দেখা দেয় তাহলে সমস্ত জীবনটাই যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। দেহের এক জায়গায় যদি একটু ময়লা লেগে থাকে তাহলে মনে হয় না কি যেন সারা দেহটাই নোংরা হয়ে গেছে?

"মার্থার কাছ থেকে চিঠি পেতাম মাঝে মাঝে। ভাসা-ভাসা চিঠি --যেন খুব সংযতভাবে লেখা --মনের নাগাল পাওয়া শক্ত। অবশ্য আমি তার চিঠিগুলো তন্ন তন্ন করে পড়তাম, কোথাও কোন রহস্যের আভাস আছে কি না পরীক্ষা করতাম বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে। তার পর একদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মার্থার কাছ থেকে চিঠি এল একটা খামের উপর লেখা: ফ্রান্টিসেক্ মেটস্, পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি, কিন্তু ভাই, খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করে যখন পড়তে শুরু করলাম, দেখি গোড়াতেই লেখা 'প্রিয় আর্থার'।

"তখন আমার অবস্থাটা কী হল বুঝতেই পারছ। আমার হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল—অ্যাঁ! যা সন্দেহ করেছি তাই।· ব্যাপারটা আসলে মোটেই আশ্চর্য নয় –এমনটা হয়ে থাকে প্রায়ই খানকতক চিঠি লেখার পর তুমি যখন চিঠিগুলো খামে ভরছ তখন একজনের চিঠি আরেকজনের খামে ভরে দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। একেই বলে দৈবের খেলা। তবে মার্থার জন্যে দুঃখ যে না হল তা নয়, বেচারী শেষটা এমন করে ধরা দিলে নিজেকে!

"আমার সম্বন্ধে অবিচার করো না, বন্ধু—সত্যি বলছি, প্রথমটা

ভেবেছিলাম আর্থারের উদ্দেশে লেখা চিঠিখানা পড়বো না আমি, ফেরত পাঠিয়ে দেবো মার্থাকে···তা আমি দিতামও, কিন্তু ঈর্ষা মানুষের সাধু সঙ্কল্পকে ব্যর্থ করে দেয়, হীন কাজে প্ররোচনা দেয় মানুষকে। মোট কথা, চিঠিখানা আমি পড়লাম এবং সেই চিঠি তোমায় এখন দেখাতেও পারি, কারণ সেটা সঙ্গেই আছে।···এই দেখো সেই চিঠি···আমি পড়ছি, শোনো মন দিয়ে—

'প্রিয় আর্থার,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়েছে বলে রাগ করো না আমার ওপর। আমার মনটা ভারী খারাপ, ফ্রান্সির কাছ থেকে—ফ্রান্সি অবশ্য আমি---চিঠিপত্র পাইনি অনেকদিন। আমি জানি, সর্বদা সে কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, ফুরসৎ নেই একটুও—কিন্তু এতদিন স্বামীর কোনো খবর না পেয়ে আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে আছি। তোমরা পুরুষ-মানুষ, মেয়েদের এ ব্যথা ঠিক বুঝতে পারবে না।' ফ্রান্সি আসছে মাসে আসবে এখানে, তুমিও তখন আসতে পারো অনায়াসে। ফ্রান্সি লিখেছে, এখন তার হাতে একটি জটিল কেস্ রয়েছে। কেস্‌টা যে কী তা সে লেখেনি, তবে আমার মনে হয় হিউগো মুলার সম্প্রতি যে খুন করেছে কেস্‌টা সেই সম্পর্কেই। ব্যাপারটা জানবার জন্যে আমারও কৌতূহল আছে যথেষ্ট। ইদানীং ফ্রান্সির সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেছে কেন বুঝতে পারি না। ফ্রান্সি সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে বলেই কি আসো না তুমি? তোমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব যদি আগেকার মতো গাঢ় থাকতো তাহলে হয়তো তুমি জোর করেই ফ্রান্সিকে টেনে নিয়ে যেতে মোটরে করে কোথাও বেড়িয়ে আসবার জন্যে, নয়তো বাড়িতে বসেই দু'দণ্ড গল্প করতে বন্ধুকে খুশি করবার উদ্দেশ্যে। বরাবরই তুমি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছ আমাদের সঙ্গে এবং এখনও যে আমাদের ভুলে যাওনি এ বিশ্বাস আমার আছে, যদিও তোমার ভাবান্তর লক্ষ্য করছি কিছুদিন থেকে। ফ্রান্সি একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ—পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে সে কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। তোমার স্ত্রী কেমন আছে তা তুমি লেখোনি কেন?

ফ্রান্সি লিখেছে প্রাগ্-এ গরম পড়েছে বেজায়, দিনকতক তাই এখানে এসে থাকবে বলে মনস্থ করেছে—কিন্তু চিঠিতে যাই লিখুক না কেন, শরীরের সম্বন্ধে চিরদিনই সে উদাসীন। এখনও হয়তো অনেক রাত পর্যন্ত অফিসেই থাকে—বাড়ি ফেরার কথা মনেই থাকে না। সমুদ্রতীরে যাচ্ছ কবে? আশা করি, স্ত্রীকে নিতে ভুলবে না। স্বামীকে ছেড়ে থাকতে মেয়েদেব যে কী কষ্ট তা তোমরা বুঝবে না। ইতি

শুভার্থিনী

মার্থা মেট্সোভা

"বল তো টৌনিক, এই চিঠিখানার সম্বন্ধে কী তোমার অভিমত? আমি জানি, এ চিঠি নিতান্ত নীবস ও মামুলী—না আছে ভাষাব জৌলুস, না আছে ভাবেব বৈচিত্র্য। কিন্তু মার্থাব চবিত্র—অর্থাৎ কিনা ঐ হতভাগা আর্থারেব প্রতি মার্থার মনোভাব—বুঝতে এই চিঠি যে কতখানি সাহায্য কবেছে তা বলা যায় না। মার্থা যদি অকপটে সব কথা বলতো আমাব কাছে, তাহলে আমি নিশ্চয় বিশ্বাস কবতাম না তাকে --কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবে যা হাতে এসে পড়ল তার গুরুত্ব অগ্রাহ্য কবি কি করে? ইচ্ছে করে মার্থা এটা করেনি, নিছক অসাবধানতায় ঘটে গেছে ব্যাপারটা। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, সত্য —সবল অবিমিশ্র সত্য—প্রকাশ হয় শুধু দৈবেব কারসাজিতে, মানুষের বুদ্ধি-কৌশলে নয়। আনন্দে আমাব চীৎকাব কবতে ইচ্ছে হচ্ছিল—তবে ঐ আনন্দের অন্তবালে লজ্জা ও গ্লানি যে না ছিল তা নয়—কী বোকার মতোই না স্ত্রীকে সন্দেহ করে এসেছি এতকাল!

তার পর কী কবলাম আমি? হিউগো মুলার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত নথিপত্র ফিতে দিয়ে বেশ করে বেঁধে ড্রয়াবে চাবিবন্ধ কবলাম এবং পরের দিনই উপস্থিত হলাম ফ্রাঞ্জেন্সবাড্-এ। মার্থা আমায় দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল অনূঢ়া কিশোরীর মতো, কথা কইতে গিয়ে বার কতক জড়িয়ে গেল কথা। ঐ অবস্থায় কেউ যদি তাকে দেখতো তবে সে নিশ্চয়ই ভাবতো, একটা মস্ত বড় অন্যায় সে করেছে।

আমি দিব্যি সপ্রতিভভাবে তাকিয়ে রইলাম। খানিক পরে মার্থা বললে,—'ফ্রান্সি, আমার চিঠি পেয়েছিলে তো?'

'কোন্ চিঠি?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বললাম আমি—'চিঠিপত্র তুমি তো লেখো খুব কমই।'

মার্থা চকিত দৃষ্টিতে একবার তাকাল আমার পানে, তার পর লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল—মনে হল যেন একটা বোঝা নেমে গেল তার বুক থেকে।

'তাহলে নিশ্চয়ই চিঠিখানা ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম,' মার্থা বললে এবং ব্যাগের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে ভাঁজ-করা একখানা চিঠি বের করল। চিঠিখানা এই রকম: 'প্রিয় ফ্রান্সি, ভারী একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। তোমার চিঠি ভুল করে ভরে দিয়েছি মিস্টার আর্থারের নাম-লেখা খামে। আশা করি, সে-চিঠি মিস্টার আর্থার তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেরত ডাকে।'

"তার পর ঐ সম্বন্ধে আর একটিও কথা হল না। আমি অবশ্য হিউগো মুলারের অনুষ্ঠিত লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কাহিনী সবিস্তারে বলতে শুরু করলাম এবং মার্থাও শুনতে লাগল পরম আগ্রহের সঙ্গে। আমার বিশ্বাস, আজও সে মনে করে ঐ চিঠিখানা আমার হাতে পৌঁছয়নি।

"ব্যাপারটা আগাগোড়াই বললাম। ঐ ঘটনার পর থেকে আর কিছু না হোক, সংসারে শান্তিটা ফিরে এসেছে। বল তো ভাই, স্ত্রীর সম্বন্ধে অহেতুক সন্দেহ পোষণ ক'রে আমি কি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিইনি? কিন্তু অতীতে যে অন্যায় করেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তুত। মার্থাকে সব দিক দিয়ে সুখী করাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য। ওর ঐ চিঠিখানা পড়বার আগে আমি ধারণাই করতে পারিনি আমায় ও অত ভালোবাসে···যাক, এখন আমার মন থেকে ঐ সন্দেহের মেঘ সরে গিয়েছে—আমি এখন সহজ-ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। পাপ করলে মানুষের যতটা আত্মগ্লানি হয়, বোকার মতো কাজ করলে লজ্জাটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি।

সে যাই হোক, দৈবের সাহায্যে কেমন করে একটা বিষয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেলে তো ?"

* * *

উপরে বর্ণিত দুই বন্ধুর বাক্যালাপের দিন কয়েক পরে সেই যুবকটি —যাকে এখানে আর্থার নামে অভিহিত করা হয়েছে—মার্থাকে উদ্দেশ করে বললে, "ওটায় কোন কাজ হল, প্রিয়ে ?"

"কিসের কথা বলছ, প্রিয়তম ?"

"যে চিঠিটা ভুল করে পাঠিয়েছিলে মেটস্-এর কাছে।"

"আমার মনে হয় কাজ ওতে ভালই হয়েছে", জবাব দিলে মার্থা। তার পর এক মুহূর্ত কি ভেবে বললে, "এখন ও আমায় যে রকম বিশ্বাস করে তাতে আমি ভারী লজ্জা পাই মনে মনে। সেই চিঠি পাওয়ার পর থেকে ওর ব্যবহারটা বদ্‌লে গেছে একেবারে—আমায় খুশি করবার জন্যে ওর এখন কী ব্যগ্রতা ! তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আমার সেই চিঠিখানা সব সময়েই ও সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে—চিঠিখানা রাখে আবার বুকের ঠিক কাছটিতে।...আমি ওকে যে ভাবে প্রতারণা করছি তা হয়তো সঙ্গত নয় মোটেই—কী বল তুমি ?" একটু যেন কেঁপে উঠল মার্থা।

মিঃ আর্থার কিন্তু মার্থার কথায় সায় দিল না - সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললে. "ওতে সঙ্কুচিত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই।"

এ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল যাঁরা তাঁদের একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ ঘটনাটি চেকোশ্লোভাকিয়া কি ফ্রান্স কি জার্মানীতে ঘটতে পারত না, কেননা ঐ সমস্ত দেশে বিচারকেরা অপরাধীদের বিচার করে থাকেন আইনের নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী, সাধারণ বুদ্ধি বা বিবেকের নির্দেশকে ওঁরা আমল দেন না কোনকালে। এ গল্পে বিচারক যে রায় দিতে বসে আইনের বিধান নিয়ে মাথা ঘামাননি, সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এর থেকেই অনুমান করা যেতে পারে, আমরা যে ঘটনাটি বিবৃত করতে যাচ্ছি তা ইংলণ্ড ছাড়া আর কোথাও ঘটতে পারত না—বস্তুতঃ ঘটনাটি ঘটেছিল লণ্ডনে, ঠিকমত বলতে গেলে কেনসিংটনে—না, দাঁড়ান একটু, ক্রম্পটনে অথবা বেজওয়াটারে—মোদ্দা ওরই কাছাকাছি কোন একটা জায়গায়। বিচারক অবশ্য এক্ষেত্রে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট, নাম মিঃ কেলি জে-পি। আর মামলাটা ছিল জনৈকা মহিলার বিরুদ্ধে—নাম স্রেফ মায়ার্স, পদবীর বালাই নেই, মিসেস্ এডিথ মায়ার্স।

উক্ত মহিলা—যদিচ তাঁর চালচলন পুরাদস্তুর শিষ্টজনোচিত—গোয়েন্দা-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির নেকনজরে পড়েন।

একদিন সন্ধ্যায় চা পান করতে করতে মিঃ ম্যাকলিয়ারি স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, "দেখো, মিসেস মায়ার্সের কথা মন থেকে আমি তাড়াতে পারছি না কিছুতেই। ভদ্রমহিলার খরচপত্র চলে কি করে, কী ওঁর পেশা কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। ভাবো দেখি একবার, এটা হ'ল ফেব্রুয়ারি মাস, উনি কিনা এসময় ওঁর চাকরকে বাজারে

পাঠিয়েছেন অ্যাস্‌পারেগাস কিনতে। বাপ! কী নবাবী কাণ্ড!...এত টাকা ওঁর আসে কোত্থেকে? আমি লক্ষ্য করেছি, রোজ ওঁর কাছে বারো থেকে কুড়ি জন মেয়ে দেখা করতে আসে আর হরেক রকমের মেয়ে তারা—চাকরানী থেকে শুরু করে জমিদারনী পর্যন্ত। আমি জানি তুমি বলবে ওঁর পেশা হয়তো ভাগ্যফল বলা—গণৎকারের ব্যবসা ফেঁদেছেন উনি। হয়তো তা সত্যি, কিন্তু এমনও তো হতে পারে ওটা ওঁর লোক-দেখানো পেশা, অন্য কারবার চালাচ্ছেন গোপনে, ধরো গিয়ে, মেয়ে বিক্রি বা গুপ্ত খবর সংগ্রহ। জানোই তো, আজকাল দেশে গুপ্তচরের আমদানি হয়েছে বিস্তর। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না আমার—এর সমাধান করতেই হবে।"

"আমি বলি এ কাজটা ছেড়ে দাও আমার হাতে—সমাধানের পথ সহজ হয়ে যাবে," প্রস্তাব করল ম্যাকলিয়ারির স্ত্রী।

পরের দিন মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি বিয়ের আংটিটা খুলে রেখে, অনূঢ়া কিশোরীর মত বেশভূষা করে বেজওয়াটারে, হয়তো বা মেবিলিবোনে মিসেস মায়ার্সের দরজায় হানা দিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাক এল মিসেস্ মায়ার্সের কাছ থেকে।

নবাগতার চেহারা ও সাজসজ্জা ভালো করে লক্ষ্য করে বৃদ্ধা মহিলা বললেন, "বসো বাছা, কী তোমার দরকার বল তো?"

"উনিশ বছর পেরিয়ে কাল আমি কুড়ি বছরে পড়বো—ভবিষ্যৎটা জানবার জন্যে হঠাৎ মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে," কুণ্ঠিতস্বরে জবাব দিল মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি।

"কিন্তু মিস্...ও, নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি এখনও..." টেবিলের উপর থেকে একতাড়া তাস তুলে নিয়ে জোরে জোরে ভাঁজতে শুরু করলেন মিসেস্ মায়ার্স।

"জোন্স," মৃদুস্বরে উত্তর দিল মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি।

"দেখো মিস্ জোন্স, আমায় ভুল বুঝো না যেন। তাস দেখে ভাগ্যফল বলার পেশা আমার নয়, তবে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে ওটা

করি মাঝে মাঝে যা প্রায় প্রত্যেক বৃদ্ধাই করে থাকে।...আচ্ছা, বাঁ হাতে ধরো দেখি এই তাসের তাড়াটা...এবার সাজাও পাঁচটা থাক করে...হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। মাঝে মাঝে তাসের সাহায্যে ভাগ্যফল নির্ণয় করতে মজা লাগে আমার, কারণ এটা আমার কাছে কৌতুক মাত্র, তা'ছাড়া কিছু নয়..." মৃদু হেসে বললেন মিসেস্ মায়ার্স, তারপর প্রথম থাক থেকে গোটাকতক তাস টেনে নিলেন একসঙ্গে।

"রুইতন হচ্ছে অর্থসম্পদের লক্ষণ...আর হরতনের গোলাম...এও অর্থভাগ্য সূচনা করে..."

"শুধুই অর্থ...আব কিছু নেই ভাগ্যে?" মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি বললে বেদনার সুরে।

মিসেস্ ম্যাকলিয়াবির কথায় কর্ণপাত না করে বৃদ্ধা এবার দ্বিতীয় থাক থেকে খানকতক তাস নিলেন তুলে।

"ইস্কাবনের দশ...ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে দেখছি।...কিন্তু এ কি? চিড়িতন, চিড়িতনে বোঝায় মানসিক উৎকণ্ঠা.. তবে ওর নীচেই রয়েছে হবতনের বিবি..."

"কী বোঝায় এতে?" মিসেস্ ম্যাকলিয়ারির দুই চোখ ঔৎসুক্যে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় থাক থেকে গোটাকতক তাস টেনে নিয়ে মিসেস্ মায়ার্স কতকটা আত্মগতভাবেই বললেন, "আবার রুইতন দেখছি যে!" তাবপব এক মুহূর্ত থেমে মিসেস্ ম্যাকলিয়াবির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখো বাছা, টাকাকড়ি বিস্তর আছে তোমাব ভাগ্যে, কিন্তু একটা কথা তোমায় ঠিক বলতে পারছি না...তোমাকে যেতে হবে অনেক দূরে, তবে সে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কি প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তা ঠিক ধরতে পারছি না..."

"খুড়ীকে দেখতে শীগ্‌গিরই আমাকে যেতে হবে সাউদাম্পটনে," মন্তব্য করল মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি।

"তা'হলে ভ্রমণটা তো মিলে গেল হাতে হাতে," মিসেস্ মায়ার্স বললেন চতুর্থ থাকের তাস কাটতে কাটতে। "হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে

তোমার ঘনিষ্ঠ একটা সংযোগের সম্ভাবনা রয়েছে···লোকটি আধাবয়সী···” চিন্তান্বিতভাবে মিসেস্ মায়ার্স বলতে থাকেন হাতের একখানা তাসের দিকে চোখ রেখে।

“সম্ভবত আমার খুড়ো,” মিসেস ম্যাকলিয়ারি বললে উৎসাহিত-ভাবে।

“এবার আর ভুল হবে না আমার, যা বলবো সব ঠিক ঠিক মিলে যাবে,” মিসেস মায়ার্স বললেন পঞ্চম থাকের তাস ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে। “দেখো মিস্ জোন্স, এবার যে তাস উঠেছে এর চেয়ে ভালো তাস কারো বেলায় উঠতে দেখিনি আজ পর্যন্ত। এই বছরের শেষদিকে বিয়ে হবে তোমার···বিয়ে হবে খুব ধনী একজন যুবকের সঙ্গে। যুবকটি হয় বনেদী বড় লোক, না হয় মস্ত ব্যবসাদার, কারণ ভ্রমণের দিকে ঝোঁক তার খুব বেশী, কিন্তু তোমাদের মিলনের পথে বিস্তর বাধা এসে পড়বে। একজন আধাবয়সী লোক তোমাদের মিলন ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করবে —তা করুক, তুমি হাল ছেড়ো না কিছুতেই, বিয়ে হয়ে গেলে অনেক দূরে চলে যাবে তুমি, সম্ভবত সমুদ্রের ওপারে। আমার দক্ষিণা হচ্ছে এক গিনি, তবে ও টাকাটা আমি দিই খ্রীষ্টান মিশনে গরীব কাফ্রীদের উপকারের জন্যে।”

হাতব্যাগটা থেকে একটি পাউণ্ড আর একটি শিলিং বার করে মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি উচ্ছ্বসিতভাবে বললে, “আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিসেস্ মায়ার্স। আচ্ছা, আপনি যে-সব বাধা-বিপত্তির কথা বললেন তার সংস্রব এড়িয়ে আমি যদি বিনা ঝঞ্ঝাটে ভাগ্যফলটা পেতে চাই তাহলে কত দক্ষিণা দিতে হবে আমায় ?”

“তাসকে ঘুষ দিয়ে বশ করা চলে না,” গম্ভীরভাবে বললেন মিসেস্ মায়ার্স—“তোমার খুড়ো করেন কি ?”

“খুড়ো কাজ করেন পুলিসে—মানে গোয়েন্দা বিভাগে।” মিথ্যাটা মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি বললে নিতান্ত সহজ সুরে।

“তাই নাকি ?” বৃদ্ধা তাসের তাড়াটা থেকে তিনখানা তাস টেনে নিলেন চট্ করে। “তোমার খুড়োর সময়টা ভালো যাচ্ছে না মোটেই

ওঁকে তুমি বোলো, বড় একটা বিপদ রয়েছে ওঁর সামনে। বেশী যদি জানতে চান উনি, তাহলে আমার কাছে আসতে পারেন অনায়াসে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কত অফিসারই তো আসা-যাওয়া করেন আমার কাছে—ভাগ্যফল জানতে। ওঁরা যা জানতে চান খোলসা করে বলেন আমাকে—আমিও চেষ্টা করি ওঁদের উৎকণ্ঠা দূর করতে।···খুড়োকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে—বিপদটা খুব সাংঘাতিক। ওঁর কথা মনে রাখবো আমি—উনি কাজ করেন, কোথায় যেন বললে—গোয়েন্দা বিভাগে? নামটা হ'ল মিঃ জোন্স? ওঁকে বলো, আমি ওঁকে সাহায্য করতে সব সময় প্রস্তুত···আমার সঙ্গে দেখা করেন যেন।"

চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মিঃ ম্যাকলিয়ারি বললেন, "ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে ঠেকছে। তোমার মৃত খুড়োর সম্বন্ধে স্ত্রীলোকটির অত্যধিক কৌতূহল রীতিমত সন্দেহের উদ্রেক করে। তা'ছাড়া ওর আসল নাম মায়ার্স নয়, মাইয়ার হোফার···আর ওর বাড়ি লুবেকে। জাতিতে ও জার্মান—শয়তানের ধাড়ী!" মিঃ ম্যাকলিয়ারি গর্জন করে ওঠেন, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার তিনি বলতে থাকেন, "যেমন করে হোক, ওর কৌশল ব্যর্থ করতে হবে। ওর মতলব ভাল নয়, কৌশলে লোকের মনের কথা বের করে নেওয়াই ওর পেশা। কর্তাদের আমি জানিয়ে দেবো ব্যাপারটা··দেখি কি হয়!"

মিঃ ম্যাকলিয়ারি সত্যিই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করলেন। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষও এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই রহস্যজনক কিছু একটা আছে এর মধ্যে, ফলে দু'চার দিনের মধ্যেই মিসেস মায়ার্সকে হাজির হতে হ'ল মিঃ কেলি জে-পির এজলাসে।

"মিসেস মায়ার্স, আপনার সম্বন্ধে কী এ সব শুনছি? আপনি নাকি তাস দেখে ভাগ্যফল বলেন?" ম্যাজিস্ট্রেট বললেন গম্ভীর মুখে।

"ধর্মাবতার! পয়সা রোজগারের জন্য একটা কিছু করা আমার দরকার। এই বয়সে আমি তো আর নাচঘরে গিয়ে নাচতে পারি না!" জবাব দিলেন মিসেস্ মায়ার্স।

"হুঁ," ম্যাজিস্ট্রেট কতকটা সায় দিলেন তাঁর কথায়, "কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আপনি নাকি তাসের ব্যাখ্যা যথাযথ করেন না। এটা অত্যন্ত খারাপ। ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায় জানেন? লোকে এসে আপনার কাছে চাইলে চকোলেটের কেক আর আপনি তাদের দিলেন কিনা মাটির গোটাকতক ঢেলা! এক গিনি দক্ষিণার বিনিময়ে লোকে নিশ্চয়ই নির্ভুল গণনা দাবি করতে পাবে।...আপনি যখন ভাগ্য গণনা করতে জানেন না তখন এ ব্যবসা করেন কেন?"

"কেউ তো অভিযোগ কবে না বড় একটা," বৃদ্ধা বললেন আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে, "লোকে যা চায় তাই-ই ভবিষ্যদ্বাণী করি আমি। এতে ওবা যে আনন্দটা পায় তার দাম কম নয় আব আমাব ভবিষ্যদ্বাণী ফলেও যায় প্রায়ই। একজন মহিলা আমায় বলেছিলেন, আমি তাঁব ভাগ্যফল যেরকম নির্ভুল বলেছি তেমনটি আব কেউ পারেনি, আর আমি তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাও নাকি যথেষ্ট উপকাব কবেছে তাঁর। তিনি থাকেন সেণ্ট জন্স্ উডে এবং সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদেব মামলা করেছেন স্বামীর বিরুদ্ধে..."

"ও সব বাজে কথা রাখুন," ম্যাজিস্ট্রেট থামিয়ে দেন মিসেস্ মায়ার্সকে, "আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী বয়েছে একজন। মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি, এবার বলুন আপনার বক্তব্য।"

"তাস দেখে মিসেস্ মায়ার্স আমায় বলেছিলেন," বলতে শুরু করে মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি, "বছর শেষ হবার আগেই বিয়ে হবে আমার, আর আমার ভাবী স্বামী হবে একজন ধনবান যুবক, তাব সঙ্গে আমায় যেতে হবে সমুদ্রের ওপারে।"

"সমুদ্রের ওপারে? তার মানে?" ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করেন অনুসন্ধিৎসুভাবে।

"ইস্কাবনের নহলা ছিল দ্বিতীয় থাকটাতে, মিসেস্ মায়ার্স তাই

দেখে বলেন, ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে," জবাব দেয় মিসেস ম্যাকলিয়ারি।

"ধ্যেৎ!" ম্যাজিস্ট্রেট গর্জন করে ওঠেন বিরক্তিভরে। "ইস্কাবনের নহলা হচ্ছে আশার প্রতীক। ভ্রমণের সূচনা করে ইস্কাবনের গোলাম—আর সেই সঙ্গে যদি থাকে রুইতনের সাতা, তাহলে বুঝতে হবে ভ্রমণটা হবে দীর্ঘ এবং তাতে লাভও হবে কিঞ্চিৎ। মিসেস্ মায়ার্স, আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবেন না আপনি। সাক্ষীকে আপনি বলেছেন, বছর কাবাব হবার আগেই ওর বিয়ে হবে একজন ধনী যুবকের সঙ্গে। কিন্তু বছর তিনেক আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে গোয়েন্দা-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির সঙ্গে, আর মিঃ ম্যাকলিয়ারিও লোক খুব চমৎকার। মিসেস্ মায়ার্স, এই অসঙ্গতির কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?"

"আশ্চর্য বটে!" বৃদ্ধা অবাক হয়ে তাকালেন মিসেস্ ম্যাকলিয়ারির মুখের দিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এরকম ভুল মাঝে মাঝে হয় বৈকি। এই মেয়েটি যখন আমার কাছে আসে তখন ওর পোশাক-পরিচ্ছদে খুব আড়ম্বর ছিল বটে, কিন্তু ওর বাঁ হাতের দস্তানাটা ছিল ছেঁড়া। তা থেকে আমার ধারণা হয়, ওর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কিন্তু ওর বড়মানুষি করবার সখ আছে। তাছাড়া ও আমায় বলে ওর বয়স কুড়ি, কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে ওর বয়স পঁচিশ–"

"চব্বিশ," মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি বললে প্রতিবাদের সুরে।

"ও একই হ'ল -চব্বিশ আর পঁচিশে তফাৎ কতটুকু। বিয়ে করার ইচ্ছাও প্রকাশ করে ফেলেছিল—অর্থাৎ কিনা ও আমায় জানিয়েছিল ও অবিবাহিত। কাজেই আমি এমন কয়েকখানা তাস নিলাম সাজিয়ে যাতে ওর বিয়ে আর ধনবান স্বামী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। ভাবলাম এই উপায়ে মেয়েটিকে যতটা খুশি করা যাবে আর কিছুতেই ততটা পারা যাবে না হয়তো।"

"আর আপনি যে বাধাবিপত্তির কথা বলেছিলেন, আধা-বয়সী

ভদ্রলোক, সমুদ্রপারে যাত্রা—সে সবের মানে ?" মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি জিজ্ঞাসা করে বিমূঢ়ের মত।

"তোমার কাছে যে টাকাটা নেবো তার বিনিময়ে বেশী কিছু না বললে চলবে কেন ? একটা গিনি নিয়ে দু'চারটি কথা বলে বিদায় দিই কি করে ?" মিসেস মায়ার্স বলেন সহজ কণ্ঠে।

"যাক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনার," ম্যাজিস্ট্রেট গম্ভীরভাবে বলেন মিসেস মায়ার্সকে। "তাস দেখে আপনি যে-ভাবে ভাগ্যফল বলেন তা নিছক জুয়াচুরি। তাসের ব্যাখ্যা সহজ নয়—রীতিমত গবেষণা দরকার। অবশ্য এ সম্বন্ধে নানা মত আছে নানা জনের, তবে আমার যতদূর স্মরণ হয়, ইস্কাবনের নহলায় ভ্রমণ বোঝায় না। খাদ্যে ভেজাল দেয় যারা কিংবা বাজে জিনিস বিক্রি করে যারা তাদের যেমন জরিমানা দিতে হয়, আপনাকেও তেমনি জরিমানা দিতে হবে পঞ্চাশ পাউণ্ড। তা'ছাড়া মিসেস মায়ার্স, এরকম একটা সন্দেহও রয়েছে যে আপনি গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে এদেশে এসেছেন। আমি অবশ্য আশা করি না যে, আপনি এ অভিযোগ স্বীকার করবেন।"

"এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা," মিসেস মায়ার্স জবাব দেন দৃঢ়-কণ্ঠে।

"থাক, ও সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলতে চাই না—প্রমাণ নেই যখন। কিন্তু যেহেতু আপনি বিদেশী এবং জীবিকা নির্বাহের আপনার কোন সদুপায় নেই, আপনাকে আর এদেশে আমরা থাকতে দিতে পারি না, আপনাকে যেতে হবে অন্যত্র। বিদায়, মিসেস মায়ার্স · ধন্যবাদ, মিসেস ম্যাকলিয়ারি।...হ্যাঁ, একটা কথা না বলে পারছি না—ভাগ্যফল সম্বন্ধে এই মিথ্যাভাষণ অত্যন্ত লজ্জাকর ও গর্হিত। আশা করি, এটা স্মরণ রাখবেন, মিসেস মায়ার্স।"

"এখন আমি করি কি ? সবে যখন পসারটা একটু জমিয়ে এনেছি তখনই কিনা..." মিসেস মায়ার্স বললেন একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

বছরখানেক পরে গোয়েন্দা-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির সঙ্গে দেখা হ'ল মিঃ কেলির।

"চমৎকার আজকের দিনটা!" খোশ মেজাজে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কেলি। "খবর সব ভাল তো? মিসেস ম্যাকলিয়ারি আছেন কেমন?"

মিঃ ম্যাকলিয়ারির মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। "মিসেস ম্যাকলিয়ারি?...ও, তিনি বেশ ভালই আছেন...তিনি...কি জানেন, মিঃ কেলি," ইতস্তত করেন মিঃ ম্যাকলিয়ারি, "তিনি তো নেই এখানে ...মানে তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমার..."

"বল কি, মিঃ ম্যাকলিয়ারি?" বিস্ময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দুই চোখ কপালে ওঠে—"অ্যাঁ! আমি যে এ ভাবতেও পারিনি কোনদিন! অমন চমৎকার মেয়েও শেষে..."

"মেয়েদের কথা আর বলবেন না মশায় সবাই সমান। কোথাকার একটা ফচ্‌কে ছোড়া ওর রূপ দেখে গেল মজে আর ও ও কিনা তাকে দিলে আস্কারা!... ব্যাপারটা গোড়ায় জানতাম না আমি জানলাম যখন, তখন ওদের আশনাইটা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। ছোড়াটার নাকি টাকা-পয়সা আছে বিস্তর, মেলবোর্নের ব্যবসাদার। আমি অবশ্য স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম অনেক, কিন্তু-" মিঃ ম্যাকলিয়ারি হাতের একটা ভঙ্গী করে নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করলেন, 'সবই নিস্ফল হ'ল। এক হপ্তা আগে ওরা রওনা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।"

হত্যার প্রচেষ্টা

সেদিন সন্ধ্যায় নিভৃতে বসে বেতারে' যন্ত্রসঙ্গীত উপভোগ করছিলেন মিঃ তোমশা। ড্ভোরাক-এর নাচের মনমাতানো একটি সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছিল বেতারে। সুরের মোহময় আবেশে তাঁর মুখে চোখে বেশ একটি তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে—এমন সময় বাইরে দু'বার গুলী ছোঁড়ার শব্দ হল আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মাথার ঠিক উপরের জানালা থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ল কয়েক টুকরো কাচ। যে-ঘরে বসেছিলেন মিঃ তোম্শা সেটি নীচেব তলায়।

তাবপব এক্ষেত্রে আমরাও যা করি তিনিও করলেন তাই। প্রথম তিনি অপেক্ষা কবলেন এক মুহূর্ত—এর পর কী ঘটে তা লক্ষ্য 'করবার জন্য। তারপব—হ্যাঁ, ঠিক তার পবই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন মিঃ তোম্শা কারণ কেউ যে তাঁকেই লক্ষ্য করে জানালার ভিতর দিয়ে দু'বার গুলী ছুঁড়েছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল ইত্যবসরে। ঠিক তাঁর বিপরীত দিকে দরজার কবাটের খানিকটা কোথায় উধাও হয়েছে এবং তারই নীচে বসে গিয়েছে গুলীটা। প্রথমটা তাঁর ইচ্ছা হল ছুটে রাস্তায় বেবিয়ে গিয়ে বদ্মায়েসটার কলার ধরে কয়েকটা চড় কষিয়ে দেন তাকে। কিন্তু বয়স হলে মানুষকে কতকটা শালীনতা বজায় রেখে চলতে হয়, তাই মনের প্রথম আবেগটাকে দমন ক'রে দ্বিতীয়টির অনুকূলেই সিদ্ধান্ত করে সে। সুতরাং মিঃ তোম্শা বেগে ধাবিত হলেন টেলিফোনের দিকে এবং থানায় সংবাদ দিলেন পুলিসের সাহায্যের জন্য।

"হাল্লো!" চীৎকার করেন মিঃ তোম্শা, "এখনই কাউকে পাঠিয়ে

দিন এখানে। এইমাত্র একটা চেষ্টা হয়েছে আমাকে খুন করবার জন্য।"

"কোথায় ?" তন্দ্রাজড়িত অলস কণ্ঠের প্রশ্ন আসে।

"এখানে·· আমার এই ফ্ল্যাটে।"

হঠাৎ রাগের আতিশয্যে ফেটে পড়েন মিঃ তোম্‌শা—যেন এ অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য পুলিসই দায়ী।

"বিনা কারণে এমনি বেপরোয়া গুলী ছোড়া—বিশেষ করে একজন নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিকের প্রতি—শুধু অন্যায় নয়, অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত। সমাজে যদি এমনি বিশৃঙ্খলা চলে তাহলে···"

"বেশ, আমরা একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার ফ্ল্যাটে," নিদ্রালস কণ্ঠের উত্তর শোনা যায়।

অত্যন্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন মিঃ তোম্‌শা। পুলিসের কর্মচারীদের শৈথিল্য দেখে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হয়ে ওঠে তার পক্ষে। বিশ মিনিট পরেই অবশ্য একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার এসে হাজির হলেন, কিন্তু ঐ বিশ মিনিট বিশ ঘণ্টার চাইতেও দীর্ঘ মনে হয় মিঃ তোম্‌শার কাছে।

যে জানালাটির কাচ ভেদ করে গুলী এসেছিল ঘরের মধ্যে সেটি বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা ক'রে গম্ভীরমুখে ইনস্পেক্টার বলেন, "এই জানালার দিকে লক্ষ্য ক'রে কেউ যে গুলী ছুঁড়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

"একথা আমিও বলতে পারতাম। তখন ঐ জানালার ধারেই বসেছিলাম আমি," মিঃ তোম্‌শা বলেন উগ্রকণ্ঠে।

ছুরির সাহায্যে দরজার কবাট থেকে গুলীটা বের করে নিয়ে, বেশ করে পরীক্ষা ক'রে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইন্‌স্পেক্টার বলেন, "সাত মিলিমিটার ক্যালিবার। মনে হচ্ছে পুরোনো ধরনের রিভলবারের বুলেট এটা। যে লোকটা এই গুলী ছুঁড়েছে সে দাঁড়িয়েছিল জানালার খুব নিকটেই। রাস্তার ওপর থেকে গুলী ছুঁড়লে গুলীটা উঠে যেত আরও উপরদিকে। অর্থাৎ কিনা লোকটা গুলী ছুঁড়েছিল আপনাকেই লক্ষ্য ক'রে।"

"তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি দরজাটাকেই লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছে।" শ্লেষবিকৃত কণ্ঠে বলেন মিঃ তোম্‌শা।

মিঃ তোম্‌শার শ্লেষ উপেক্ষা ক'রে ইনস্পেক্টার প্রশ্ন করেন, "লোকটা কে বলুন দেখি?"

"তার ঠিকানা আপনাকে দিতে পারছি না বলে বিশেষ দুঃখিত," জবাব দেন মিঃ তোম্‌শা অসহিষ্ণুভাবে, "ভদ্রলোকটিকে আমি দেখিনি এবং তাঁকে ভিতরে আমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে অপরাধীকে খুঁজে বের করা কঠিন," নিরাসক্তভাবে বলেন ইনস্পেক্টার। "কিন্তু আপনি সন্দেহ করেন কাকে?"

মিঃ তোম্‌শার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

"সন্দেহ?" বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ তোম্‌শা। "বদমায়েসটাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু যদি সে অপেক্ষাও করতো যতক্ষণ না তাকে একটি প্রীতির চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছি— তাহলেও অন্ধকারে চিনতে পারতাম না তাকে। দেখুন মশাই, লোকটা কে তা যদি জানতাম তাহলে কি মনে করেন আপনাকে কষ্ট দিয়ে টেনে আনতাম এখানে?"

"হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই," সান্ত্বনার সুরে বলেন ইনস্পেক্টার "তবে আপনি হয়তো এমন কোন লোককে মনে করতে পারেন যে বিশেষ লাভবান হবে আপনার মৃত্যুতে, কিংবা যার কোন আক্রোশ আছে আপনার ওপর। ··দেখুন মশাই, চুরি করা লোকটার উদ্দেশ্য ছিল না। নিতান্ত বেকায়দায় না পড়লে চোর গুলী ছোড়ে না কখনো। কিন্তু এমন কোন লোক থাকতে পারে হয়তো, যে আপনার ওপর ভয়ঙ্কর ঘৃণা পোষণ করে। আর সেটা বলতে পারেন শুধু আপনি, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের যদি সেরকম কিছু খবর দিতে পারেন, তখন আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।"

হঠাৎ যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন মিঃ তোম্‌শা। কৈ, এ চিন্তা তো একবারও মাথায় আসেনি তাঁর!

"আমি তো এমন কারো কথা ভাবতেই পারছি না," চাকরিজীবনের

ফেলে-আসা বছরগুলোর দিকে চকিতে ফিরে তাকিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেন মিঃ তোম্‌শা।

"আমার ওপর কার আক্রোশ থাকতে পারে?" চিন্তিতমুখে বলেন মিঃ তোম্‌শা "যতদূর জানি, আমার একজনও শত্রু নেই জগতে। হ্যাঁ, আমার যে কোন শত্রু নেই একথা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।"

"আমার শত্রু থাকা একেবারে অসম্ভব," মাথা নেড়ে দৃঢকণ্ঠে বলেন তিনি— "কারো সঙ্গে ঝগড়া করি না আমি, মেলামেশাও নেই কারো সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের বালাই নেই, কারো কোন ব্যাপারে মাথা গলাই না পারতপক্ষে। আমার ওপর লোকের আক্রোশ হবে কিসের জন্যে?"

কাঁধটা ঈষৎ নেড়ে ইনস্পেক্টার বিরসমুখে বলেন, "তা আমি জানি না মশাই। তবে কাল হয়তো এমন কিছু মনে পড়তে পারে আপনার, যা থেকে এ ঘটনার সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। এখানে একা থাকতে আপনার ভয় হচ্ছে না তো?"

"না," চিন্তিতভাবে জবাব দেন মিঃ তোমশা।

ইনস্পেক্টার চলে যাবার পর মিঃ তোম্‌শা যখন একা হলেন তখন এক অস্বস্তিকর চিন্তা তাঁর মনটাকে অধিকার করে বসল। বাস্তবিক এটা ভারী অদ্ভুত মনে মনে তিনি বলেন, আমার মত নির্বিবাদী লোককে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে এমন লোকও আছে! এত লোক থাকতে আমার ওপর এ আক্রমণের কারণ কী? আমি তো একরকম সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী অফিসে গিয়ে সারাদিন কাজ করি। তারপর সোজা বাড়ি ফিরে আসি কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ-আলোচনা করার সুযোগই ঘটে ওঠে না। আমাকে হত্যা করবার জন্য তবে এ আয়োজন কেন? মানুষের নিষ্করুণ ব্যবহারে মনটা তিক্ত হয় তাঁর। ভাবতে ভাবতে ক্রমশ নিজের প্রতি করুণায় সারা মন সিক্ত হয়ে ওঠে।

অফিসে কী খাটুনিটাই খাটতে হয় আমাকে। তাতেও কি রেহাই আছে? বাড়িতেও বয়ে আনতে হয় কাজ, সকল সময় শুধু

খেটেই চলেছি। আমোদ-আহ্লাদ করে অযথা পয়সা খরচ করি না, ভালো খাবারও খাই না কোনদিন, শম্বুকের মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছি নিজের খোলের মধ্যে—অথচ আমাকে মারবার জন্যে কিনা গুলী ছোঁড়ে মানুষে! মানুষের শয়তানির কথা ভেবে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান মিঃ তোম্‌শা। কারো কোন ক্ষতি করেছি আমি? কেন আমার প্রতি এমনি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ পোষণ করবে অপরে?

রাত্রে বিছানার ওপর বসে ভাবতে থাকেন মিঃ তোম্‌শা—হাতে সদ্য পা থেকে খোলা বুট জুতোটা। হয়তো ভুল হয়ে থাকবে লোকটার—যার ওপর তার আক্রোশ, মনে করেছে আমিই বুঝি সে-ই! নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন মিঃ তোম্‌শা। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তাই--নইলে আমার ওপর কার বিদ্বেষ থাকতে পারে?

হঠাৎ কী যেন মনে পড়তেই জুতোটা খসে পড়ে মিঃ তোম্‌শার হাত থেকে। মিঃ তোম্‌শা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সত্যি, ও কথা বলা মোটেই ভালো হয়নি আমার, কিন্তু ওটা আমার মনের কথা নয়, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অসাবধানে। রুবল্-এর সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি -কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় একটা কুৎসিত মন্তব্য করে ফেলি ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে—যদিও ওকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার। সবাই অবশ্য জানে, চতুরা সুন্দরী মেয়েরা গোপনে অনেকের সঙ্গেই প্রেমের কারবার করে, তাদের স্বামীরাও যে না জানে এমন নয়, কিন্তু তারা যে জানে এটা চাপা রাখতে চায় সযত্নে। কেউ যদি হঠাৎ ওকথা উত্থাপন করে বসে—অমনি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাগে। আর আমি--নিতান্ত গর্দভ কিনা, তাই ওকথা ফস্ করে বলে ফেললাম ওর সামনে! মিঃ তোম্‌শার মনে পড়ে, কথাটা শুনে কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ল রুবল্—তারপর তার হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হল রাগে। বাস্তবিক, লোকটি ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছিল মনে। মনে মনে মিঃ তোম্‌শা শিউরে ওঠেন যেন! হয়তো বা স্ত্রীর ওপর ওর ভালবাসাটা এমনি আন্তরিক যে তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনরকম ইঙ্গিত বরদাস্ত করতে সে অপারগ। তারপর অবশ্য ব্যাপারটাকে লঘু করার

জন্য চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু মনের ঘা সহজে আরাম হতে চায় কি? হ্যাঁ, একবার যেন সে দাঁতে ঠোঁট চেপে রুখে উঠেছিল। আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তার—ভাবেন মিঃ তোম্‌শা অনুতাপের সঙ্গে। জানি আমাকে মারবার জন্য গুলী ছোঁড়েনি সে, ওকথা ভাবা নিতান্ত বাতুলতা, তবে আমি সত্যিই আশ্চর্য হতাম না যদি…

মেঝের দিকে লজ্জিতভাবে চেয়ে থাকেন মিঃ তোম্‌শা। পুরোনো সেই দর্জির প্রতি তাঁর ব্যবহারটাও সঙ্গত হয়নি মোটেই। পনেরো বছর ধরে বেচারী আমার কাজ করে এসেছে - একদিন শুনলাম ওর নাকি যক্ষ্মারোগ হয়েছে। যক্ষ্মারোগীর হাতে তৈরী পোশাক পরতে আপত্তি করাটা এমন কিছু অন্যায় নয়, কাজ করতে করতে কতবারই না ও কেশেছে পোশাকের ওপর, সুতরাং ওকে কাজ দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। তারপর একদিন সে এল আমার কাছে, অনুনয় করে বললে, কাজকর্ম ওর কিছুই নেই, স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত, ছেলেমেয়েগুলিকে অন্যত্র পাঠাতে পারে যদি আমার কাজটা ফিরে পায়। রোগে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে লোকটা, রক্তহীন পাণ্ডুর চেহারা, কথা কওয়াও যেন কষ্টকর ওর পক্ষে।

"মিস্টার কোলিন্‌স্কি", তাকে উদ্দেশ করে বললাম, "দেখো আমায় অনুরোধ করা বৃথা। একজন ভালো দর্জি চাই আমার—তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, স্যর", উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বলে—ভয়ে ও লজ্জায় সারা দেহ তার ঘামে ভিজে ওঠে। লোকটা যে কেঁদে ফেলেনি এটাই আশ্চর্য। আর আমি কিনা তাকে ভাগিয়ে দিলাম শুধু এই কথা বলে, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।" ও আশ্বাসবাক্যের মানে যে কী তা ঐ হতভাগারা ভালোরকমই জানে। হ্যাঁ, ঐ হতভাগ্য দর্জির পক্ষে আমায় ঘৃণা করাটা আদৌ অসঙ্গত নয়, শঙ্কিতচিত্তে ভাবেন মিঃ তোম্‌শা। নিতান্ত প্রাণের দায়ে অপরের কাছে এসে কাকুতি-মিনতি করা এবং শেষটা নির্দয়ভাবে বিতাড়িত হওয়া—সত্যিই এর চেয়ে

মর্মান্তিক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু ওর সম্বন্ধে কীই বা করতে পারতাম আমি? ওকে যদি কাজ দিতামও, তাহলেও ওর পক্ষে তা করা সম্ভব হত না, কিন্তু···

আরও যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন মিঃ তোম্‌শা। আরও একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার উঁকি মারে মনের মধ্যে। সেদিন যেভাবে অফিসের বেয়ারাটাকে তিরস্কার করেছিলাম তা মোটেই সঙ্গত হয়নি। কি একটা ফাইল খুঁজে পাইনি বলে বুড়ো মানুষটাকে এমনিভাবে গালিগালাজ করেছিলাম সকলের সামনে যেন ও অর্বাচীন স্কুলের ছাত্র। কাগজপত্র এইভাবে রাখতে হয় নাকি? তোমার মত মূর্খ তো দেখিনি কখনো—সামান্য একটা কাজ, তা'ও করতে পারো না ঠিকমত! জিনিসপত্র চারিধারে ছড়ানো—নোংরা অপরিষ্কার-কে বলবে সরকারী দপ্তরখানা এটা? তোমাকে এখনই বরখাস্ত করা উচিত-অপদার্থ কোথাকার! তারপর খুঁজতে খুঁজতে ফাইলটা পেলাম আমারই টেবিলের ড্রয়ারে। বেচারী প্রতিবাদ করেনি একবারও, শুধু কাঁপছিল ভয়ে এবং আমার দিকে তাকিয়েছিল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। অধস্তন একজন কর্মচারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব নয় মোটেই, মনে মনে বলেন ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে। কিন্তু ওরা না জানি উপরওয়ালাদের কত ঘৃণাই করে! আচ্ছা, ঐ বেয়ারাকে ডেকে এখন যদি পুরোনো জামাকাপড় কিছু দিই তো কেমন হয়? কি জানি, হয়তো এতে সে আরও অপমানিত বোধ করবে নিজেকে।

বিছানায় শুয়ে থাকা নিতান্ত অসহ্য হয়ে পড়ে মিঃ তোম্‌শার। নরম চাদরের নীচেও বুকটা হাঁপিয়ে ওঠে যেন। বিছানায় উঠে বসেন তিনি—ছ'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন অন্ধকারের দিকে। তরুণবয়স্ক মোরাভেকের সঙ্গে অফিসে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল মনে পড়ে যায় বেদনার সঙ্গে। ছেলেটি সুশিক্ষিত, কবিতাও লেখে বেশ। কি একটা কাজে ভুল হয়েছিল ওর, রেগে

গিয়ে বললাম, আবার ওটা গোড়া থেকে করো—এ রকম ভুল করলে তোমাকে দিয়ে অফিসের কাজ চলবে কি ক'রে?

চিঠির তাড়াটা আমি অবশ্য টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা গিয়ে পড়ল তার পায়ের নীচে। চিঠির তাড়া কুড়িয়ে নেবার জন্য যখন ও নীচু হল তখন লক্ষ্য করলাম, ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও বেশ লাল। ছি ছি, সামান্য কারণে ওরকম উত্তেজিত হওয়া মোটেই উচিত হয়নি আমার—আত্মগ্লানি জাগে মিঃ তোম্‌শার মনে। ছেলেটিকে সত্যিই ভালবাসি আমি, অথচ হঠাৎ কেমন চটে উঠে অপমান করলাম ওকে!

আর একখানি মুখ ভেসে ওঠে মিঃ তোম্‌শার মনে—সহকর্মী ওয়াঙ্কল্-এর শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ। বেচারী ওয়াঙ্কল্! মনে মনে বলেন মিঃ তোম্‌শা, ও চেয়েছিল ডিপার্টমেন্টের কর্তা হতে, কিন্তু ঐ পদটা পেয়ে গেলাম আমি। ঐ চাকরিতে প্রমোশন পেলে বছরে আরও কয়েক শো ক্রাউন বেশী আয় হত ওর এবং ওর অর্থের দরকারও খুব। দু'টি ছেলেমেয়ে ওর—শুনেছি, বড় মেয়েটিকে ভালো করে গান শেখাবার ইচ্ছে, কিন্তু সে সঙ্গতি নেই ওর।...ওকে টপ্‌কে ওপরে উঠে গেলাম আমি, কারণ লোকটা তেমন চালাক চতুর নয়, শুধু খেটে মরে গাধার মত। ওর স্ত্রী অত্যন্ত উগ্র মেজাজের, রোগা চিম্‌শে চেহারা, সব সময় মুখে বিরক্তির ভাব। অভাব অনটনের সংসারে মেজাজ ঠিক রাখা অবশ্য কোন গৃহিণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় শুক্‌নো রুটি ছাড়া আর কিছুই জোটে না ওয়াঙ্কল-এর। মনটা বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে মিঃ তোম্‌শার। হতভাগ্য ওয়াঙ্কল্! বেচারী যখন দেখে ওর চেয়ে আমি মাইনে পাচ্ছি ঢের বেশী - যদিও পরিবার পোষণ করার দায়িত্ব আমার নেই, তখন আমার ওপর ওর মনটা বিষিয়ে ওঠে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার দোষই বা কী? ও যখন আমার দিকে তাকায় তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তখন ভারী অস্বস্তি বোধ করি আমি।

দারুণ অস্বস্তিতে কপালটা ভিজে ওঠে ঘামে—হাত দিয়ে কপালটা মুছে ফেলেন মিঃ তোম্‌শা। মনে মনে বলেন, হ্যাঁ, হোটেলের সেই

চাকরটাও আমার ওপর চটেছিল খুব।" লোকটা কয়েক ক্রাউন ঠকিয়েছিল আমায়। মালিককে ডেকে বললাম সে কথা, আর মালিক তাকে বরখাস্ত করলে সঙ্গে-সঙ্গে। "চোর···বদ্মায়েস—বেরিয়ে যাও এখান থেকে," রাগে গর্জন করে ওঠে মালিক, "প্রাগ্-এ যাতে কেউ তোমায় চাকরি না দেয় সে ব্যবস্থা আমি করবো।" লোকটা নিঃশব্দে চলে গেল একটিও কথা না বলে। বেচারী নিতান্ত অভাবগ্রস্ত—না খেয়ে শরীরটা যে তার শুকিয়ে গিয়েছে তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

বিছানায় বসে থাকা অসহ্য মনে হয় মিঃ তোম্শার। বেতারযন্ত্রের পাশে এসে বসেন গান শুনে মনটাকে একটু হাল্কা করবেন বলে, কিন্তু যন্ত্র তখন নীরব—নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝে সেও যেন মৌন হয়ে রয়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকেন মিঃ তোম্শা, মনের মধ্যে এসে ভীড় জমায় যত সব অদ্ভুত তুচ্ছ মানুষ—যাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

সকালবেলায় থানায় এসে হাজির হন মিঃ তোম্শা। মুখখানা বিবর্ণ, চোখের চাউনিতে অস্থিরতা।

"বলুন তো মশাই, আপনার ওপর আক্রোশ থাকতে পারে এমন কা'রো কথা মনে পড়ল কি আপনার?" জিজ্ঞেস করেন পুলিস ইনস্পেক্টার।

মিঃ তোম্শা মাথা নাড়েন। ইতস্তত করে বলেন, "না, কারো কথাই মনে করতে পারছি না।···দেখুন, এত বেশী লোকের আমার ওপর আক্রোশ থাকতে পারে যে তাদের মধ্যে কে যে···"

হাতের একটা ভঙ্গী করে নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করেন মিঃ তোম্শা। "আসল কথাটা এই যে, কত লোকের যে আপনি ক্ষতি করে থাকতে পারেন, তা বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। দেখুন, আর কখনো ঐ জানালার ধারে বসবো না আমি। আমি এসেছি আপনাকে অনুরোধ করতে এ নিয়ে আপনি যেন আর অগ্রসর না হন।"

সেলভিনের মামলা

"হুঁ, আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় সাফল্য অর্থাৎ যে সাফল্য আমায় আনন্দ দিয়েছে সবচেয়ে বেশী -"

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন ক'রে বলতে শুরু করেন বৃদ্ধ লিওনার্দ আনদেন, কবি নাট্যকার, নোবেলপুরস্কারবিজয়ী ইত্যাদি।

"আমার তরুণ বন্ধুগণ, খ্যাতির জয়মালা, জন-সম্বর্ধনা, নারীর প্রেম বা ঐশ্বর্যের পাগলামি যা কিছু আছে তার প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণই থাকে না আমার বয়সে, বিশেষ করে এগুলো যখন নিতান্ত পুরানো হয়ে গেছে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। এগুলো মানুষ উপভোগ করে যৌবনে এবং যদি কেউ না করে সে নিতান্ত নির্বোধ। অবশ্য মুশকিল এই যে, যৌবনে মানুষ নানান্ ব্যাপারে এমন ব্যস্ত হয়ে থাকে যে কোনো কিছু নিশ্চিন্তমনে উপভোগ করবার অবসর নেই তার। আমার মতে জীবনটার চলা উচিত উল্টো দিকে। গোড়াতেই মানুষ হবে বৃদ্ধ এবং তখন যত সব দরকারী কাজ করবে প্রাণপণ উৎসাহে যেহেতু অন্য কিছু করবার যোগ্যতা নেই তার। তারপর যৌবনে সে পৌঁছুবে বেশ কিছুকাল পরে যাতে দীর্ঘ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারে নিশ্চিন্ত আরামে। বার্ধক্যে মানুষ প্রগল্ভ হয়ে পড়ে, অসংলগ্ন কত কী বলে ফেললাম। যে-কথা বলতে শুরু করেছিলাম তার খেই হারিয়ে গেছে। কী বলছিলাম বল তো? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে গৌরবময় সাফল্য কী? সেকথা আজ বলবো তোমাদের। মনে ক'রো না, আমার লেখা কোনো নাটক বা কাব্যগ্রন্থের কথা ভাবছি আমি—যদিও এমন একটা সময় ছিল

যখন সত্যিই আমার লেখা সাগ্রহে পড়তো সবাই। আমার সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে সেলভিন কেস্।

ঐ কেস্ সম্পর্কে ঘটনাবলী জানা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল আজ থেকে ছাব্বিশ—না, উনত্রিশ বছর আগে।

হ্যাঁ, উনত্রিশ বছর আগে একদিন সকালে কালো পোশাক-পরা এক খর্বাকৃতি শুভ্রকেশ বৃদ্ধা মহিলা দেখা করতে আসেন আমার সঙ্গে।

কী তিনি চান কবিজনোচিত শিষ্টাচারের সঙ্গে এ প্রশ্ন জিজ্ঞসা করার আগেই ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে নতজানু হয়ে মেঝেয় বসে পড়লেন আমার সামনে এবং কাঁদতে শুরু করলেন আকুলভাবে। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়লাম যেহেতু মেয়েদের কান্না আমি বরদাস্ত করতে পারি না মোটেই।

বৃদ্ধা মহিলাকে কতকটা শান্ত করার পর তিনি বললেন, 'আপনি কবি, আপনার কাছে আমার মিনতি আমার পুত্রকে বাঁচান। মানব-জাতির প্রতি আপনার অকৃত্রিম প্রীতি ও সহানুভূতি, আমার হতভাগ্য পুত্রের প্রতি আপনি কখনই বিরূপ হবেন না। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন ফ্রাঙ্ক সেলভিন্ সম্বন্ধে···'

মনে হয় আমার মুখের চেহারাটা তখন নিতান্ত হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। নির্বোধ শিশুর মত দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলাম অপরিচিতা বৃদ্ধার দিকে। খবরের কাগজ যদিও প্রত্যহই পড়তাম, ফ্রাঙ্ক সেলভিন সম্বন্ধে কোনো খবরই নজরে পড়েনি আমার। যাই হোক্, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি যা বললেন তা থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিলাম। তাঁর একমাত্র পুত্র বাইশ বৎসর বয়স্ক ফ্রাঙ্ক সেলভিন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে তার মাসী সোফিকে হত্যা ও তাঁর অর্থ অপহরণের চেষ্টা করার অভিযোগে। কেসটা খারাপই ছিল, তার ওপর সেলভিন অপরাধ অস্বীকার করায় আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায় জুরীদের চোখে।

'কিন্তু সে সম্পূর্ণ নির্দোষ,' কাতরস্বরে বলেন বৃদ্ধা—'আমি শপথ

করে বলতে পারি, সে নির্দোষ। যেদিন ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে সেইদিন রাত্রে ফ্রাঙ্ক আমায় বলে, ভয়ানক মাথা ধরেছে মা—যাই, একটু খোলা মাঠে বেড়িয়ে আসি। এই কারণেই হত্যাকাণ্ডের সময় সে যে অন্যত্র উপস্থিত ছিল এটা সে প্রমাণ করতে পারেনি। রাত্রে কোনো যুবককে পথে দেখলেও ক'জন ভালো করে লক্ষ্য করে তাকে? স্বীকার করি, ফ্রাঙ্ক একটু বেপরোয়া গোছের ছেলে, কিন্তু যৌবনে কেই বা শান্তশিষ্ট থাকে? আপনিও তো যুবক ছিলেন একদিন—যুবকদের দোষত্রুটি আপনার অজানা নেই। একবার ভেবে দেখুন, ফ্রাঙ্কের বয়স মাত্র বাইশ বছর। ওর সমস্ত জীবনটা ওরা নষ্ট করে দিতে চায় নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত।'

আরও অনেক কিছু বলেন বৃদ্ধা অশ্রুজড়িতকণ্ঠে। আমার মনে হয়, তোমরা যদি সেই ভগ্নহৃদয় অসহায় বৃদ্ধা জননীকে দেখতে তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে—আমি যেমন বুঝেছিলাম তখন—যে, জীবনের সব চাইতে ভয়ঙ্কর সঙ্কট হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির প্রতি দয়াপরবশ হওয়া যার দুঃখমোচনে আমরা একান্ত অক্ষম। যাই হোক, বৃদ্ধাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমার পক্ষে যা সম্ভব সবই করবো আমি এবং এ ব্যাপার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে চেষ্টার ত্রুটি হবে না এতটুকু। তাকে আমি এ আশ্বাসও দিলাম যে, তাঁর পুত্র যে নির্দোষ এ আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। তারপর যখন ঐ হতভাগিনী নারী গদ্‌গদকণ্ঠে আমাকে আশীর্বাদ করতে শুরু করলেন তখন সত্যিই আমি এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে আর একটু হলেই হয়তো তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তাম আবেগের আতিশয্যে। উপকৃত ব্যক্তি যখন তোমাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে যেন তুমি সম্মুখে দণ্ডায়মান ক্ষুদ্র দেবতা বিশেষ, তখন তোমার অবস্থাটা যে অত্যন্ত কৌতুককর হয়ে ওঠে একথা বলাই বাহুল্য।

সেইদিন থেকে ফ্রাঙ্ক সেলভিনের ব্যাপার নিয়ে উঠে পড়ে লাগলাম আমি। অবশ্য প্রথমে আদালতের রিপোর্টটা পড়লাম তন্ন তন্ন করে। বাস্তবিক এ ধরনের অন্যায় অশোভন বিচার দেখিনি ইতিপূর্বে। এটাকে

বিচার বলা যায় না কোনমতে, বিচারের প্রহসন মাত্র। ব্যাপারটা নিতান্ত সরল। মাসী সোফির পরিচারিকা অ্যান্ সোলার একদিন রাত্রে পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় কর্ত্রীর ঘরে। অবশ্য জানা দরকার, ঐ পরিচারিকার বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে এবং মনটাও তেমন সহজ ও সুস্থ নয়। আওয়াজটা শুনে তার মনে হয় কে যেন চলাফেরা করছে ঘরের মধ্যে। অত রাত্রে কর্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েননি কেন এটা জানবার জন্য কর্ত্রীর ঘরে সে ঢোকে। ঢুকে দেখে জানলা খোলা এবং কে একজন জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করছে পাশের বাগানে। মুহূর্তের জন্য তার চেহারাটা দেখা যায় জানলার ধারে। সঙ্গে-সঙ্গে পরিচারিকা চেঁচামেচি শুরু করে দেয় তারস্বরে এবং প্রতিবেশীরা আলো নিয়ে এসে দেখে মিস্ সোফি মেঝের উপর পড়ে আছেন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায়—তার নিজের রুমালখানি গলায় বাঁধা। পোশাকের আলমারিটা যার মধ্যে টাকাকড়ি রাখতেন তিনি খোলা রয়েছে, কাপড় জামা ইতস্তত ছড়ানো। টাকাকড়ি যথাস্থানেই রয়েছে, সম্ভবত পরিচারিকার আকস্মিক আবির্ভাবে হত্যাকারী টাকাকড়ি নেবার সুযোগ পায়নি। মামলার ঘটনা সংক্ষেপে এই।

পরের দিন গ্রেপ্তার হয় ফ্রাঙ্ক সেলভিন। ফ্রাঙ্ক যখন জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে তখন তাকে নাকি চিনতে পারে সোফির পরিচারিকা বিচারের সময় প্রকাশ পায়, হত্যাকাণ্ডের সময় বাড়িতে ছিল না ফ্রাঙ্ক। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাড়ি ফেরে সে এবং আহার না করেই শুয়ে পড়ে। তাছাড়া এও প্রকাশ পায়, ফ্রাঙ্ক ঋণগ্রস্ত। তার ওপর আবার একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আদালতে এসে সাক্ষ্য দেয় যে, হত্যাকাণ্ডের দিন কয়েক আগে মিস্ সোফি নাকি তাকে গোপনে বলেছিলেন যে, তার বোনপো ফ্রাঙ্ক তাঁর কাছে এসেছিল কিছু টাকা ধার চাইতে এবং মিস্ সোফি ধার দিতে অস্বীকার করায় ফ্রাঙ্ক নাকি বলে, দেখো মাসি, শীগ্‌গির এমন একটা ঘটনা ঘটবে যা সবাইকে রীতিমত আশ্চর্য করে দেবে। ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে যা জানা যায় তা এই।

এবার বিচারের ব্যাপারে আসা যাক বিচার সাঙ্গ হতে সময় লাগে মাত্র অল্প ক দিন। ফ্রাঙ্ক সেলভিন কেবলমাত্র বলে যে, সে নির্দোষ, সন্ধ্যার পর সে বেড়াতে বেরোয় এবং বাড়ি ফিরে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। সাক্ষীদের কাউকে জেরা করা হয়নি। ফ্রাঙ্কের উকিল ছিলেন নিতান্ত নির্বোধ এক বৃদ্ধ। তিনি অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে কেসটা হাতে নিয়েছিলেন যেহেতু মামলা চালাবার আর্থিক সামর্থ্য মিসেস সেলভিনের ছিল না। ভদ্রলোক তার কর্তব্য যথাযথ পালন করেননি—তাঁর একমাত্র আবেদন ছিল এই যে, তার মক্কেলের বয়স নিতান্ত অল্প এবং তার এই অল্প বয়সের কথা চিন্তা করে জুরী যেন অনুকম্পা প্রদর্শন করেন তার প্রতি। সরকারী উকিলও ঐ যুক্তির বিরোধিতা করেন সঙ্গে-সঙ্গে। সেলভিনের মামলার মাস কয়েক আগে দুজন আসামীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তীব্র ভাষায় জুরীকে আক্রমণ করেন তিনি। জুরীরা যদি ন্যায় বিচার না করে অপরাধকে এইভাবে প্রশ্রয় দেন, তবে সমাজের অবস্থা দাড়াবে কোথায়? জুরীকে উদ্দেশ করে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি। মনে হয়, সরকারী উকিলের এই যুক্তি জুরীকে প্রভাবান্বিত করেছিল, তারা বোধ করি দেখাতে চাইল যে, তাদের সম্বন্ধে শৈথিল্যের অভিযোগ আনা আর কোনদিন সম্ভব হবে না। তাদের সিদ্ধান্তে ফ্রাঙ্ক সেলভিন দোষী সাব্যস্ত হল - এগারোজন ভোট দিল সিদ্ধান্তের পক্ষে, আর একজন বিপক্ষে। সমস্ত ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

ঐ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর আমার মেজাজটা রীতিমত গরম হয়ে উঠল। অসহ্য রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লাম আমি, যদিও আইনব্যবসায়ী আমি নই—কিংবা একথাও বলা যেতে পারে, যেহেতু আইনব্যবসায়ী আমি নই। একবার ভেবে দেখো তোমরা—সরকার পক্ষের সাক্ষী সুস্থচিত্ত নয়, বয়স তার পঞ্চাশের ওপর, কাজেই জীবনের এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সে—যখন তার উক্তি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। জানলায় আততায়ীকে সে দেখেছিল

রাত্রে। সেই রাত্রিটা ছিল—এটা আমি জানতে পারি পরে—গরম কিন্তু অত্যন্ত অন্ধকার। কাজেই লোকটিকে নিশ্চিতরূপে চিনতে পারা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না মোটেই। অন্ধকারে মানুষের উচ্চতা ঠিকমত আন্দাজ করা যায় না—এ বিষয়টা নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। তাছাড়া, ফ্রাঙ্ক সেলভিনের ওপর ঐ পরিচারিকার ঘৃণা ছিল অপরিসীম, যেহেতু ঐ বৃদ্ধাকে সে পরিহাস করতো প্রায়ই। ফ্রাঙ্ক নাকি তার নাম দিয়েছিল 'শুভ্রবাহু হিবি'—কি জানি কেন, এতে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতো।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যার উল্লেখ প্রয়োজন। মাসী সোফি ঘৃণা করতেন তাঁর বোন মিসেস্ সেলভিনকে এমন কি তারা কথা বলতেন না পরস্পরের সঙ্গে। মিস সোফি ফ্রাঙ্কের মাকে গালি দিতেন অজস্র। ফ্রাঙ্ক তাঁকে ভয় দেখিয়েছে এ কথা যদি সোফি বলেও থাকেন, তাহলে বোনের বদনাম রটাবার জন্য সেটা যে তার বিদ্বেষ-প্রসূত উক্তি নয় একথা জোর করে বলা যায় না। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে সব মেয়ে কুমারী থাকে তারা স্বভাবতই সঙ্কীর্ণমনা হয়। ফ্রাঙ্কের সম্বন্ধে সন্ধান করে জানলাম, সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক সে, কেরানীর কাজ করে কি একটা অফিসে, তার এক প্রণয়িনী আছে যাকে সে প্রেমপত্র লেখে আবেগপূর্ণ ভাষায় এবং কবিতাও লেখে নিকৃষ্ট ছন্দে। দেনাও কিছু আছে তার, তবে তার জন্য বেচারাকে দোষ দেওয়া চলে না, কারণ ওর স্বভাবটা ছিল এমনি বেয়াড়া যে অল্পবয়সেই মদ খাওয়া শুরু করেছিল। ওর মা অতি শান্তস্বভাব নিরীহ গোছের মানুষ -দুঃখ, দারিদ্র্য আর কান্নাতে একেবারে বিপর্যস্ত। ভালো করে বিশ্লেষণ করার পর ব্যাপারটা যা বুঝলাম তা এই।

অবশ্য, তখন অর্থাৎ আমার সেই গৌরবোজ্জ্বল জীবন-মধ্যাহ্নে আমি যে কী রকমটা ছিলাম তা তোমরা জানো না। তখন একবার উত্তেজিত হলে আমাকে কেউ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না আমি তখন করলাম কী, জানো? খবরের কাগজে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম 'সেলভিনের মামলা' এই শিরোনামা দিয়ে। সরকারপক্ষের

সাক্ষীদের উক্তি যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় তা আমি দেখালাম ঐসব প্রবন্ধে। সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে যেসব গলদ ছিল তা বিশ্লেষণ করলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তাছাড়া কয়েকজনের উক্তি যে নিছক বিদ্বেষপ্রসূত তাও উল্লেখ করতে দ্বিধা করলাম না। অন্ধকার রাত্রে বৃদ্ধা পরিচারিকার পক্ষে আততায়ীকে চিনতে পারা যে নিতান্ত অসম্ভব, তা আমি প্রমাণ করলাম যুক্তির সাহায্যে। বিচারক যে তাঁর কর্তব্য যথাযথ পালন করেননি এবং সরকারপক্ষের উকিল যে যুক্তিতর্কের অবতারণা না করে শুধু উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে বাজি মাৎ করেছেন এ মন্তব্য করতেও ছাড়লাম না আমি। কিন্তু ভেবো না, ঐখানেই কর্তব্য শেষ করলাম আমি। মামলাটা নিয়ে যখন আন্দোলন শুরু করেছি, তখন এগিয়ে যাবার সাহস আমার যথেষ্টই ছিল। সমগ্র বিচার-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করলাম আমি—পেনাল কোড, জুরীপ্রথা, সমাজের ঔদাসীন্য ও স্বার্থপরতা কিছুই রেহাই পেল না আমার আক্রমণ থেকে। আমার ঐ লেখালেখির ফলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হল তা সহজেই অনুমেয়। ঐ সময় কবি হিসাবে কিছুটা খ্যাতি ছিল আমার, তরুণের দল সমর্থন করল আমার পক্ষ। একদিন অপরাহ্নে রীতিমত একটা জনবিক্ষোভ হল আদালতের সামনে। তখন যুবক সেলভিনের উকিল ছুটে এলেন আমার কাছে। আমি যে একটা নিদারুণ ভুল করে বসেছি এই ধারণায় তিনি একেবারে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন, বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেছেন তিনি, তাঁর বিশ্বাস সেলভিনের কারাবাসের মেয়াদ কমে যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু বর্তমানে আপীল আদালত জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী হবে না এবং আপীল নাকচ করবে নিশ্চয়ই। মাননীয় উকিল মহাশয়কে আমি বললাম, আমি কেবল সেলভিনের মামলা নিয়ে লড়াই করছি না, সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সেলভিনের উকিল যা আশঙ্কা করেছিলেন ঘটল তাই। আপীল নাকচ হল, তবে ঐ মামলার বিচারককে অবসর গ্রহণ করতে হল চাকরি থেকে। অদম্য উৎসাহ নিয়ে আমি এগিয়ে চললাম দুর্বার

গতিতে। বাস্তবিক, সে সময়ে যে সংগ্রাম করেছিলাম আজও সেটাকে ন্যায়ের জন্য ধর্মযুদ্ধ বলেই মনে করি। তোমরা জানো ঐ ব্যাপারের পর বিচার ব্যবস্থায় অনেক সংস্কার হয়েছে এবং ওর জন্য কিছুটা কৃতিত্ব যে আমার তা তোমরা স্বীকার করবে নিশ্চয়ই। সেলভিনের মামলার কথা প্রকাশিত হল সারা পৃথিবীর খবরের কাগজে। নানা জায়গায় শ্রমিকদেব সভায় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে বক্তৃতা দিলাম আমি।

'সেলভিনের মামলার পুনর্বিচার চাই' সে সময়ে ছিল বিশেষ জনপ্রিয় একটা আন্তর্জাতিক শ্লোগান—যেমন আজকালকার দিনে 'যুদ্ধ পরিহাব কবো' অথবা 'নারীদের ভোটাধিকাব চাই'। সেলভিনেব মা যখন মারা গেলেন, সতেবো হাজাব লোক ঐ দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধা মহিলার শবের অনুগমন করেছিল এবং আমি এক বক্তৃতাও কবেছিলাম তাঁর উন্মুক্ত কববের পাশে দাঁড়িয়ে— অমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা জীবনে কোনদিনই কবিনি আমি। কি জানো, প্রেবণা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর জিনিস।

দীর্ঘ সাত বৎসব ঐ যুদ্ধ চালিয়ে গেলাম এবং ঐ যুদ্ধই আমায় প্রতিষ্ঠিত কবল গৌববেব সিংহাসনে। আমাব আন্তর্জাতিক খ্যাতিব মূলে ঐ সেলভিনেব মামলা—আমাব লেখা গ্রন্থাবলী নয়। আমি জানি, 'বিবেকেব বাণী', 'সত্যাশ্রয়ী বীব', এমনি কত কী আখ্যায় লোকে অভিহিত করে আমাকে ওব কোনো কোনোটা লেখাও হবে আমার সমাধিব ওপব প্রস্তবফলকে। এও আমি বিশ্বাস কবি, আমাব মৃত্যুর পর চৌদ্দ পনেবো বৎসব অথবা আবও কিছুকাল স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে লেখা হবে আমার প্রশস্তি—লিওনার্দ আন্‌দেন্ সত্যেব জন্য যে সংগ্রাম করেছিল তার বিস্তারিত ইতিহাস। তারপর—হ্যাঁ, তারপর সেকথাও ভুলে যাবে লোকে—জগতে যা হয় চিরদিন।

ঐ মামলার ছ'বছর পরে সরকারপক্ষের প্রধান সাক্ষী বৃদ্ধা পরিচারিকা অ্যান সোলার মারা যায়। মারা যাবার আগে সে একটি বিবৃতি দেয় এবং সাশ্রুনয়নে স্বীকার করে যে, সে বিবেকের

দংশনে জর্জরিত। সে বলে, বিচারের সময় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল সে—জানলায় যাকে সে দেখেছিল হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে, সে যে ফ্রাঙ্ক সেলভিন একথা জোর করে সে বলতে পারে না। পুরোহিত সদাশয় ব্যক্তি, খবরটা নিয়ে এলেন আমার কাছে। দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ততদিনে আমার অভিজ্ঞতা জন্মেছে প্রচুর, কাজেই খবরটা প্রকাশ করলাম না সংবাদপত্রে। পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলাম সরকারী আইন-দপ্তরে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রাঙ্ক সেলভিনের পুনর্বিচারের হুকুম জারী হল। কিছুদিন পরে ফ্রাঙ্ককে হাজির করা হল অপর এক জুরীর সামনে। সব চাইতে নাম-করা আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকেই ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন। ফলে সরকারী উকিল জুরীকে অনুরোধ করলেন ফ্রাঙ্ককে মুক্তি দেবার জন্য এবং জুরীও ঘোষণা করল ফ্রাঙ্ক সেলভিন নির্দোষ।

হ্যা, ঐ সেলভিনের মামলাই আমার জীবনের চরম সাফল্য। অন্যান্য সাফল্য আমায় এমন পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারেনি। তবে ঐ আনন্দের সঙ্গে পেলাম একটা শূন্যতার অনুভূতি। সত্যি বলতে কি, সেলভিনের কেস্-এর অভাবটা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে লাগলাম—ওটা যেন মনের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। বিচারের পরের দিন ভৃত্য এসে খবর দিল জনৈক সাক্ষাৎপ্রার্থী অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

'আমার নাম ফ্রাঙ্ক সেলভিন,' আগন্তুক বললে এবং ধীরে ধীরে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। ওর চেহারাটা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনের অবস্থাটা যে তখন কী হল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ফ্রাঙ্ক সেলভিন—যাকে নিয়ে এতকাল তীব্র আন্দোলন করে এসেছি, নির্যাতিত মানবতার প্রতীক হিসাবে যাকে জগতের সামনে তুলে ধরেছি—সে কিনা দেখতে ঠিক ঐ ঘোড়দৌড়ের মাঠের দালালের মত! দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা, মাথায় সামান্য টাক, বেশ একটা ভারিক্কি মুরুব্বিয়ানা ভাব। তাছাড়া, ওর মুখে মদের গন্ধ।

'মহান্ প্রতিভাধর শিল্পী,' জড়িতকণ্ঠে ফ্রাঙ্ক বলে আমাকে উদ্দেশ করে (ভাবো একবার, আমাকে সম্ভাষণ করার রীতিটা ওর—'মহান্ প্রতিভাধর শিল্পী'—ইচ্ছে হল, ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিই সুমুখ থেকে), 'আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আমার প্রতি আপনার অসীম করুণার জন্য।' মনে হল ও যেন মুখস্থ করে এসেছে ঐ সমস্ত কথা।

'আমার এই জীবনের জন্য আপনার কাছে আমি ঋণী,' ফ্রাঙ্ক বলতে থাকে অভিনয়ের সুরে, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি……'

'না, এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন নেই,' ব্যস্তভাবে বললাম আমি, 'আমি যা করেছি তা কর্তব্য হিসেবেই করেছি। একবার যখন বুঝতে পারলাম তোমাকে অন্যায়ভাবে দণ্ড দেওয়া হয়েছে……'

ফ্রাঙ্ক সেলভিন মাথা নাড়ল। 'না, মহাশয়,' বিষণ্ণমুখে সে বললে, 'উপকারকের কাছে মিথ্যা বলতে পারবো না আমি। আমিই হত্যা করেছিলাম সেই হতভাগিনী বৃদ্ধাকে।'

'তবে আদালতে ও কথা বলোনি কেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকালো ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে,—'নিজের অধিকার আমি ছেড়ে দেবো কেন? নিজেকে নির্দোষ বলার অধিকার বিবাদীর আছে এ আপনি জানেন নিশ্চয়ই।'

এর পরে কী আর বলা যায়? বাধ্য হয়ে চুপ করলাম।

'এখন তুমি কী চাও আমার কাছে?' রুষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'আমি এসেছি শুধু আপনার মহানুভবতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে,' ফ্রাঙ্ক সেলভিন বললে কণ্ঠস্বরে বেদনার আবেগময়তা এনে—'আমার হতভাগিনী বৃদ্ধা মাকেও সাহায্য করেছিলেন আপনি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, মহানুভব কবি।'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' গর্জন করে উঠলাম আমি। অসহ্য রাগে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। লোকটা ভয় পেয়ে ছুটে পালালো সিঁড়ি দিয়ে।

তিন সপ্তাহ পরে, হঠাৎ একদিন রাস্তায় সে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল। কিছুতেই ওকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। মদ খেয়ে বেশ একটু নেশা হয়েছে ওর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ও যে কী চায় তা বুঝতে পারলাম না, আমার কোটের বোতামটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে শেষটা সে তার বক্তব্য বলতে শুরু করল। সে বললে, তার কেসটা আমি মাটি করে দিয়েছি—আমি যদি তার কেস নিয়ে লেখালেখি না করতাম তাহলে আপীল আদালত তার উকিলের আবেদনে কর্ণপাত করতেন নিশ্চয়ই এবং সাত বৎসর তাকে অনর্থক জেলে কাটাতে হত না। তার বর্তমান অর্থাভাবের কথা ভেবে—যার জন্য আমিই একরকম দায়ী—আমার কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই হবে, তার হাতে কিছু টাকা আমায় গুঁজে দিতে হল নিঃশব্দে। 'ভগবান আপনার কল্যাণ করুন,' অশ্রুসিক্ত চোখে সেলভিন বললে বিদায় নেবার আগে।

দ্বিতীয়বার যখন সে আমার সঙ্গে দেখা করল তখন তার মেজাজটা অন্যরকম। মনে হল যেন সে আমাকে ভয় দেখাতে চায়। সে বললে তার ঐ কেস্‌টার জন্যেই আমার উন্নতি সম্ভব হয়েছে। তার পক্ষ সমর্থন করার ফলেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছি আমি। অতএব আমার ঐশ্বর্যের অংশ থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন? আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে তার ঐ দাবী অসঙ্গত, কিন্তু কোনো যুক্তিতেই সে কর্ণপাত করল না। শেষ পর্যন্ত আরও কিছু টাকা দিলাম তার হাতে।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে সে দেখা দিত আমার বাড়িতে। প্রথমটা দু'চার মাস অন্তর, তারপর বেশ ঘন ঘন। সোফার ওপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলতো, বৃদ্ধা মাসীকে হত্যা করার জন্য অনুতাপে সে দগ্ধ হচ্ছে।

'না, এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না,' সে বলতো বিষাদের সুরে, 'সব কথা অকপটে স্বীকার করবো আমি। জানি আপনার পক্ষে সেটা মারাত্মক হবে, কিন্তু উপায় কী? এ ছাড়া শান্তি পাবার আর কোনো উপায় দেখি না।'

অনুতাপের এই সব অভিব্যক্তি আমার কাছে যে অত্যন্ত ভয়াবহ হত তা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারো। প্রতিবারই বেশ কিছু টাকা তাকে দিতে হত, যাতে ঐ অনুতাপের দহন সে সহ্য করতে পারে অনায়াসে। অবশেষে তাকে আমি একটা টিকিট কিনে দিলাম আমেরিকা যাবার জন্য। ওখানে সে শান্তি পেয়েছে কিনা বলতে পারি না।

দেখো, ঐ সেলভিন কেস্‌টাই হল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য। আমার তরুণ বন্ধুগণ, তোমরা যখন লিওনার্দ আনদেন্‌-এর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করবে তখন এই কথা লিখো যে, সেলভিনের মামলায় সংগ্রাম করে অসামান্য কীর্তি রেখে গেছেন তিনি—অক্ষয় হোক তাঁর পুণ্যস্মৃতি।"

এক রাত্রির প্রেম

বর্তমান শতকে রাশিয়ায় যে ক'জন শক্তিশালী কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে ইভান বুনিন নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। ১৮৭০ সালে ভোরোনেজ শহরে এঁর জন্ম। ১৯১৯ সালে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ইনি ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। কবিতা, উপন্যাস সব কিছুতেই এঁর দক্ষতা অসাধারণ। এঁর রচনায় এমন এক দার্শনিকতা আছে যা চিন্তাশীল পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে The Gentleman from San Francisco, The Dreams of Chang, The Village, Mitya's Love ও The Well of Days বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থখানির জন্য ১৯৩৩ সালে ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নৈশ ভোজনের পর আলোকোজ্জ্বল ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ডেকে তখন যাত্রীর ভীড় নেই। ওরা এসে দাঁড়াল রেলিঙের পাশে। চোখ বুজে হাতের পিঠটা গালের উপর রেখে মেয়েটি সশব্দে হেসে উঠল। অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ হাসিতে ঝরে পড়ে যেন। অদ্ভুত এই মেয়েটি ওর সব কিছুই যেন অপরূপ মাধুর্যে ভরা।

"মন আমার মাতাল হয়ে উঠেছে, না হয় আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছি," আবেগবিহ্বল কণ্ঠে মেয়েটি বলে "তুমি যেন হঠাৎ শূন্য থেকে নেমে এসেছ। মাত্র তিন ঘণ্টা আগেও তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার, অথচ এরই মধ্যে আমার মনটা তুমি জয় করে ফেলেছ। কোন জায়গা থেকে তুমি যে জাহাজে উঠলে তাও লক্ষ্য করিনি আমি। সামারা থেকে বুঝি? যেখান থেকেই উঠে থাকো না কেন, তা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। তোমার সঙ্গে হঠাৎ যে এই পরিচয় হয়েছে

এইটাই আমার পরম লাভ। সত্যি বলছি, মাথাটা আমার ঘুরছে, না হয় স্টীমারটাই পাক খাচ্ছে তীরে ভিড়বার জন্যে।"

সামনে দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার। দূরে অন্ধকারের মাঝে একটা চঞ্চল আলো দেখা যায়। অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে লাগে মুখে, আলোটা এগিয়ে আসে ক্রমশ, একটা ছোট স্টীমার ক্ষিপ্রগতিতে চলে যায় তাদের পাশ কাটিয়ে। ভল্‌গার তরঙ্গ-চঞ্চল বুক আলোড়িত করে ওদের স্টীমারখানা সামনের বন্দরটার দিকে এগোতে থাকে তির্যক গতিতে।

মেয়েটির হাতখানা নিয়ে লেফটেনাণ্ট নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল। ছোট্ট বলিষ্ঠ হাত—সূর্যের তাপে রঙটা একটু তামাটে। গভীর তৃপ্তির মধ্যেও লেফটেনাণ্টের মনে কেমন যেন বেদনার সঞ্চার হয়। মনে হয় ওর ঐ হাল্‌কা সূতী পোশাকের নীচে সমস্ত দেহটাই হয়তো প্রখর সূর্যতাপে এমনি কঠিন ও তামাটে হয়ে গেছে। পুরো একটা মাস ও অতিবাহিত করেছে দক্ষিণের বালুময় সমুদ্রতটে, আনাপুর নির্মম সূর্য হরণ করেছে ওর ঐ লীলায়িত দেহের সুকোমল লালিত্য। মেয়েটি যেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ওর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শে লেফটেনাণ্টের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

"এসো, আমরা নেমে যাই এখানে।" অস্ফুটস্বরে লেফটেনাণ্ট বলে।

"কোথায়?" বিস্মিতদৃষ্টিতে মেয়েটি লেফটেনাণ্টের মুখের পানে তাকায়।

"এখানে···এই বন্দরের ঘাটে।"

"কেন?"

লেফটেনাণ্ট চুপ করে থাকে। আবার মেয়েটি গালের উপর হাতের পিঠটা রেখে তেমনি হেসে ওঠে। "তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি?"

"এসো, আমরা নেমে পড়ি।" লেফটেনাণ্টের কণ্ঠস্বর কেমন যেন বিকৃত, দৃষ্টিটাও অস্বাভাবিক।

"আমি তোমায় অনুরোধ করছি, এসো…"

"বেশ, যা ভালো লাগে করো…আমি বাধা দেব না।" মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

স্বল্পালোকিত ঘাটে যাত্রীর ভিড় নেই। চলন্ত স্টীমারখানা ঘাটে এসে ধাক্কা দিতেই ওরা দুজন পরস্পরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে মোটা একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল খালাসীরা, স্টীমারটা পিছিয়ে গেল একটু, জলটা আন্দোলিত হয়ে উঠল ভীষণ শব্দে, তারপর সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল যাত্রীদের জন্যে। ব্যস্তভাবে লেফটেনাণ্ট ছুটল মালপত্র আনতে।

ঘাটের ছোট্ট নির্জন 'শেড' অতিক্রম করে ওরা এসে বাইরে দাঁড়াল। সামনেই কতকগুলো ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে যাত্রীদের জন্যে। ওরা নীরবে একখানা গাড়িতে উঠে ধূলাভরা গদীর ওপর বসে পড়ল। পথটা খাড়া, ধূলা ও বালিতে আচ্ছন্ন, দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্ট, অস্পষ্ট আলোয় একটা স্বপ্নময় আবেশ। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে গাড়ি, মনে হয় পথ বুঝি অফুরন্ত। অবশেষে খাড়া পথ ছাড়িয়ে ওরা এসে পড়ে সমতল পাকা রাস্তায়। গাড়ির বেগ এবার যেন একটু বাড়ে—ঘোড়াটা স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটতে থাকে। বড় একটা পার্ক পড়ে সামনে। চতুর্দিকে তার বড় বড় অট্টালিকা, অফিস বাড়ি বলে মনে হয়। একপাশে একটা গীর্জা, চূড়াটা তার আশপাশের বাড়িকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বাতাসে একটা উষ্ণতার আমেজ, দিনের উত্তাপ তখনও কাটেনি যেন। গাড়িটা একটা আলোকিত অট্টালিকার সামনে এসে থামল। খোলা দরজা দিয়ে কাঠের সিঁড়িটা দেখা যায়। হোটেলের একজন চাকর এগিয়ে এল অভ্যাসমত—লাল কোট পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মালগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে ক্লান্ত অবসন্নপদে সে হোটেলের ভিতর ঢুকল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ওরা একখানা বড় ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটা বেজায় গরম, রোদে পুড়েছে সারাদিন, তখনও উত্তাপ কাটেনি। জানলায় সাদা পর্দা টাঙানো, ম্যাণ্টেলপিসের ওপর বড় একখানা

আয়না ঝোলানো, তু'পাশে তুটো অব্যবহৃত মোমবাতি। মালপত্র রেখে চাকর প্রস্থান করতেই লেফটেনান্ট নিজেকে আর সামলাতে পারল না—তুর্দমনীয় আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির ওপর। তুজনেই ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হল এক গভীর চুম্বনাবেগে। অপরিমিত আনন্দের বেদনাময় তীব্রতা, কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না যেন। মেয়েটির উষ্ণ বিহ্বল দেহ উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপছে। এ অনুভূতি তাদের তুজনের কাছেই একেবারে নতুন—নিবিড় আশ্লেষে পরস্পরকে ওরা জড়িয়ে ধরে।

পরের দিন সকাল দশটা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক, ঘণ্টা বাজছে গীর্জায়, হোটেলের সামনের বাজারে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে, বাতাসে শুকনো ঘাস আলকাতরা ও আরো নানান্ রকমের গন্ধ যা এ অঞ্চলের শহরগুলির বৈশিষ্ট্য।

মেয়েটি বিদায় নিতে এল লেফটেনান্টের কাছে। অদ্ভুত মেয়ে, আত্মপরিচয় সে দেয়নি, এমন কি নামটাও বলেনি লেফটেনান্টকে, নিজেকে সন্তর্পণে ঢেকে রেখেছে এক তুর্ভেদ্য রহস্যের মায়াজালে। রাতে ওরা ঘুমোয়নি বেশীক্ষণ, কিন্তু মেয়েটি যখন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখ হাত ধুয়ে সাজগোজ করে পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল তখন ওকে দেখে মনে হল যেন এ উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী ষোড়শী তন্বীর স্বচ্ছ কোমল লাবণ্য ওর মুখে। রাত্রির ঘটনার জন্য ওকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত মনে হল না। পূর্বের মতই ও সরল স্বচ্ছন্দ ও নির্বিকার।

লেফটেনান্ট প্রস্তাব করে ওরা তুজন একসঙ্গেই রওনা হবে আবার। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, "না না, তা হয় না, প্রিয়তম। আমি একাই যাবো। পরের স্টীমার না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো তুমি। সত্যি বলতে কি, একসঙ্গে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না—ওতে সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো প্রিয়তম, আমায় দেখে তোমার যা ধারণা হয়েছে সে-ধরনের মেয়ে আমি নই। এখানে যা কিছু ঘটেছে

তা আমার জীবনে আর কোনদিন ঘটেনি আর ঘটবেও না ভবিষ্যতে। এ আমার জীবনের একটা আকস্মিক বিপর্যয়—মনের একটা সাময়িক উন্মাদনা মাত্র। হঠাৎ একটা দুরন্ত আবেগ এসে আমাকে—আমাকে বলা সঙ্গত হবে না, আমাদের দুজনকেই করেছিল অভিভূত, কিন্তু সে আবেগ স্থায়ী হয়নি বেশীক্ষণ—যেমন এসেছিল হঠাৎ তেমনি আবার চলে গিয়েছে—রোদে ঘোরাঘুরি করলে যেমন সর্দিগর্মি হয়, এও কতকটা তাই…"

লেফটেনাণ্ট ঈষৎ হেসে সায় দিল তার কথায়। উৎফুল্ল মনেই সে গাড়িতে এসে উঠল মেয়েটির সঙ্গে—স্টীমার-ঘাটে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য। গোলাপী রঙের একখানা স্টীমার ঘাটে অপেক্ষা করছে। স্টীমার ছাড়তে আর দেরি নেই। ব্যস্তভাবে খালাসীরা ডেকের উপর ছুটাছুটি করছে। ওরা এসে পৌঁছুল স্টীমার-ঘাটে। লঘু পদক্ষেপে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ডেকের উপর অন্যান্য যাত্রীদের সামনেই চুম্বন করল ওকে, স্টীমার ছাড়ার সঙ্কেতধ্বনি হল, লেফটেনাণ্ট নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে—সিঁড়িটা তখন ঘাটের আশ্রয় ছেড়ে খানিকটা সরে এসেছে।

বেশ স্বচ্ছন্দমনেই সে ফিরে এল হোটেলে। কিন্তু হোটেলে ফিরেই মনে হল যেন কী একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। মেয়েটির সুস্নিগ্ধ স্পর্শ তখনও চারিধারে বিরাজ করছে অথচ ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। চোখের দৃষ্টিটা ব্যাকুল প্রত্যাশায় চতুর্দিকে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।…তখনও বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে মেয়েটির অডিকলোনের সুমিষ্ট গন্ধ, ট্রে-র উপর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্ধেক-খাওয়া তার চায়ের পেয়ালাটা, কিন্তু তার সেই যৌবনদীপ্ত দেহবল্লরী ঘরের কোথাও নেই—সে বিদায় নিয়েছে চিরদিনের মতো!…বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন মোচড় দিয়ে ওঠে, একটা ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস কণ্ঠরোধ করে, লেফটেনাণ্ট নিজেকে সংযত করবার জন্য তাড়াতাড়ি পাইপটা ধরিয়ে নেয়, তারপর ছড়ির মাথাটা সজোরে বুটের উপর ঠুকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

"অদ্ভুত ব্যাপার!" হাসতে হাসতে আপনমনে সে বলে, যদিও বুঝতে পারে চোখের কোণে জল জমে উঠেছে—"বিশ্বাস করো প্রিয়তম, আমায় দেখে তোমার যা ধারণা হয়েছে সে-ধরনের মেয়ে আমি নই।·· অদ্ভুত মেয়ে!"

মশারির পর্দা একপাশে সরানো, গত রাত্রির শয্যা তেমনিই পড়ে রয়েছে। লেফটেনান্টের মনে হল ঐ শয্যার দিকে তাকাবার সাহস নেই তার। মশারিটা শয্যার চারিপাশে ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে সে জানলা বন্ধ করে দিল—বাজারের কলরব ও গরুর গাড়ির চাকার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ একান্ত দুঃসহ। বাতাসে জানলার সাদা পর্দাগুলো উপরদিকে উঠে গিয়েছে, সে টেনে যথাস্থানে নামিয়ে দিল। তারপর সোফায় এসে বসল পরম নিশ্চিন্ত হয়ে। এক রাত্রির রোমান্স—পথের মাঝে হঠাৎ হল মিলন আবার পথের মাঝেই বিদায়! দূরে, বহুদূরে চলে গেছে সে - যেখানে তার প্রেমের গুঞ্জন, অন্তরের আকুল আহ্বান পৌঁছুতে পারবে না। কাচ-ঢাকা সাদা রঙের কেবিনের মধ্যে বসে, নয়তো ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সে হয়তো এখন উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সুদূরপ্রসারী রৌদ্রোজ্জ্বল নদীবক্ষের দিকে—পালতোলা নৌকোগুলো সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে তর তর করে, দূরে সূর্যকিরণে চিক্ চিক্ করে হরিদ্রাভ বালুচর! ··বিদায়—চিরদিনের জন্য, অনন্ত কালের জন্য বিদায়! মিলনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই—পথের পরিচয় পথের ধূলার মাঝেই লীন হয়ে গেছে! মনে মনে সে বলে, "যেখানে ও স্নেহশীল স্বামী আর তিন বছরের মেয়েটিকে নিয়ে সযত্নে নীড় রচনা করেছে, যেখানে ওর প্রাত্যহিক জীবনের দিনগুলি কাটে পরম নিশ্চিন্ততায়, সেখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই—সেই শহরে যাওয়া কোনদিনই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।" যতই সে এ বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ততই তার মনে হয় যেন ঐ শহরটা একটা ভয়াবহ স্থান যার চতুঃসীমার মধ্যে পদার্পণ তার পক্ষে নিষিদ্ধ!···সঙ্গে-সঙ্গে এ চিন্তাও মনে জাগে, হয়তো ও তাকে ভুলতে পারবে না, ওর নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝে তাকে ওর মনে পড়বে প্রায়ই,

মনে পড়বে এই ক্ষণিক মিলনের কথা, ব্যথায় বেদনায় দুলে উঠবে ওর বুক অথচ সে ওকে শোনাতে পারবে না একটিও সান্ত্বনার বাণী! বেদনায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে, অপরিসীম নৈরাশ্যে মনটা ভেঙে পড়ে যেন। পরক্ষণে আবার সে সজাগ হয়ে ওঠে—মনকে শাসন করে, "না না, এ হতে পারে না। এ একান্ত অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য।" কিন্তু মনকে কিছুতেই শক্ত করতে পারে না, নিদারুণ অবসাদে মনটা নিস্তেজ হয়ে আসে, কেবলই মনে হয় যেন বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ-ই হয় না, জীবনের যা কিছু আনন্দ ও উৎসাহ সবই বিদায় নিয়েছে চিরদিনের মত।

"কী সব আজগুবি চিন্তা পেয়ে বসেছে আমায়!" বিরক্তভাবে সোফা থেকে উঠে পড়ে আবার সে পায়চারি করতে থাকে। খুব সতর্কভাবে পায়চারি করে সে, চোখটা কিছুতেই যেন শয্যার দিকে না পড়ে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মেয়েটির কথা মন থেকে তাড়ানো যায় না -তার উজ্জ্বল হাসি, তার সকৌতুক দৃষ্টি বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে।…"এ আমার হল কী? বার বার ওর কথা মনে হয় কেন? কী এমন অসাধারণত্ব আছে ওর মধ্যে আর ব্যাপারটাই বা কী এমন ঘোরালো? বাস্তবিক ও যা বলেছে তা ঠিকই--আমাদের ঐ উন্মাদনা সর্দিগর্মিরই মত হঠাৎ একটা উগ্র আবেগে আমাদের মনে সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিল মাত্র—ওটাকে প্রেমের অভিব্যক্তি মনে করা ভুল। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, সারাটা দিন এই নির্বান্ধব শহরে একা একা কাটাবো কি করে?"

মেয়েটিকে কিছুতেই ভোলা যায় না যেন, ওর সব কিছু বৈশিষ্ট্য অপরূপ মাধুর্যে চোখের সামনে ফুটে ওঠে— ওর গায়ের তামাটে রঙ, সূক্ষ্ম সুতীর পোশাক, সুপুষ্ট সবল দেহ, ওর সজীব আনন্দোচ্ছল কণ্ঠস্বর। ওর সুকুমার দেহের তপ্ত মদির স্পর্শ তখনও তার রক্তে নেশার আমেজ জাগিয়ে রেখেছে, এক অপূর্ব শিহরণে সারা দেহ বার বার কণ্টকিত হয়ে ওঠে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে একটা দুর্বোধ্য

রহস্যময় বেদনার অনুভূতি তার চেতনার মাঝে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে মনে সে বলে, "এ ব্যাপারটা যে কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে মর্মান্তিক কষ্ট। এ বেদনা আমায় লুকিয়ে রাখতে হবে সন্তর্পণে—যাতে কেউ টের না পায় কোনদিন। কিন্তু এখানে এই বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্র শহরে স্মৃতির এই দুঃসহ পীড়ন সহ্য করে এই দীর্ঘ দিনটা কাটাই কি করে?"

লেফটেনান্ট অস্থিরভাবে পদচারণা করে। এ যাতনা আর সহ্য হয় না যেন···মুক্তির একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন করতে হবে ···কাজ, একটা কিছু কাজ তার দরকার···কাজে ডুবিয়ে রাখতে হবে মনকে···এখানে চুপচাপ বসে আর সে স্মৃতির রোমন্থন করবে না···যেখানে হোক, সে বেরিয়ে পড়বে এখনই। টুপীটা মাথায় দিয়ে, লেফটেনান্ট পরম উৎসাহে ফাঁকা বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে চলল ফটকের দিকে। হঠাৎ কি ভেবে গতিটা শ্লথ হয়ে এল তার। কোথায় চলেছে সে—গন্তব্য তার কোথায়? দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে এদিক ওদিক সে তাকায়। ফটকের সামনেই একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে—চটকদার কোট-গায়ে গাড়োয়ান ছোট একটা সিগার টানছে নিশ্চিন্ত মনে, দেখে মনে হয় যেন অপেক্ষা করছে কা'রো জন্যে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে লেফটেনান্ট তাকায় তার দিকে। কোচ-বাক্সের উপর স্থিরভাবে বসে মানুষ যে অমন নিশ্চিন্তভাবে সিগার টানতে পারে এ যেন তার ধারণার বাইবে। "সমস্ত শহরের মধ্যে আমিই কেবল অসুখী—আর সবাই পরম নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছে।"—একটা গভীব দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতর থেকে, তারপর সে চলতে শুরু করে বাজারেব দিকে।

বেচাকেনা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ব্যাপারীরা ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত। দু'পাশে মাল-বোঝাই গাড়ি, অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে একসময় সে পা দিয়ে ফেলল খানিকটা তাজা গোবরের উপর। একদিকে জনকয়েক স্ত্রীলোক বসে আছে রকমারি তৈজসপত্র নিয়ে,

লেফটেনাণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তারা নিজের নিজের পাত্র হাতে করে তুলে ধরে চেঁচামেচি শুরু করল, আবার চাষীরাও তাকে শাঁসালো খরিদ্দার মনে করে চীৎকার করতে লাগল, "এদিকে একবার আসুন, হুজুর—চমৎকার শসা, খেলে আর ভুলতে পারবেন না।" সকলের সমবেত কোলাহলে অস্থির হয়ে সে ছুটে পালাল সেখান থেকে—এ সমস্ত তার কাছে নিতান্ত অর্থহীন ও বিরক্তিকর। বাজার থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তায় অগণ্য লোকের ভীড় —যে যার কাজে চলেছে। খানিকটা চলার পর সামনেই পড়ে গীর্জা, কি ভেবে ঢুকে পড়ল সে। অর্গ্যানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গায়করা গাইছে উদাত্ত কণ্ঠে, গানের সুরে ঝরে পড়ে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, শ্রোতারা শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মত। সবারই জীবনে আছে একটা লক্ষ্য, আছে গতি, নেই শুধু তার। গীর্জা থেকে বেরিয়ে আবার সে চলতে শুরু করে। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে পথ ঝল্‌সে যাচ্ছে, দূরের গাছপালা ধুঁকছে অবসন্নের মত। সেই রৌদ্রের মাঝেই সে চলেছে লক্ষ্যহীনভাবে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা বাগান। যত্নের অভাবে বাগানটা হতশ্রী, আগাছায় ভরে গেছে চারিধার। শ্রান্তভাবে সে তারই মধ্যে ঢুকল। বাগান থেকে ভল্‌গার প্রশস্ত বুক দেখা যায়। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসে। মনে পড়ে, ঐ নদীর বুকে তরঙ্গ তুলে সেই গোলাপী রঙের স্টীমারখানা একটু আগেই চলে গিয়েছে তার প্রিয়তমাকে নিয়ে। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভিতর থেকে। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে তার সাদা সামরিক পোশাকের বোতাম আর কাঁধের স্ট্র্যাপ এমনি তেতে উঠেছে যে স্পর্শ করা যায় না। টুপীর ভিতরকার ব্যাণ্ডটা ঘামে ভিজে গেছে, উত্তাপে মুখ চোখ রক্তবর্ণ।

হোটেলে ফিরে সুবৃহৎ নির্জন ডাইনিং রুমের আশ্রয়ে সে বেশ আরাম বোধ করল। টুপীটা খুলে সে একটা খোলা জানলার সামনে ছোট একটা টেবিলের ধারে এসে বসল। জানলা দিয়ে তপ্ত

বাতাসের হল্‌কা এসে লাগে। বাতাসে শীতলতা নেই বটে, তবু তার স্পর্শে দেহের ক্লান্তি একটু যেন কমে। হোটেলের চাকরকে ডেকে সে হুকুম করল এক পাত্র শাকসব্জীর সূপ দিয়ে যেতে—বরফে ঠাণ্ডা করা সূপ—ক্লান্তির উপশম হবে।…সব কিছুর মধ্যেই একটা আনন্দ ও উৎসাহের আভাস, একটা অপরিমেয় আনন্দ, এমন কি এই দুঃসহ উত্তাপ ও বাজারের বিচিত্র গন্ধের মধ্যেও আনন্দের একটা অপূর্ব রেশ যেন প্রচ্ছন্ন, শহরের সর্বত্র—এই বৈচিত্র্যহীন পুরোনো হোটেলেও প্রসন্নতার একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি বর্তমান…আর চারিপাশে এই আনন্দ ও সজীবতার মধ্যে শুধু তারই হৃদয় দুঃসহ বেদনায় মুহ্যমান। কয়েক গ্লাস ভড্‌কা সে পান করল—মনটা কিছুতেই শান্ত হতে চায় না, একটা সুতীব্র বেদনা মনটাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। মনে মনে সে ভাবে, দৈবাৎ যদি সে আবার ঐ অপরিচিতা তরুণীকে ফিরে পায় আর শুধু আজকের দিনটি কাটাতে পারে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তবে কালই সে স্বচ্ছন্দে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। শুধু এই কথাটা সে ওকে বলবে, নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, সে ওকে ভালবাসে সমগ্র অন্তর দিয়ে, ওর অভাবে সংসারের সব কিছু সুখ ও আনন্দ তার কাছে নিরর্থক। কিন্তু কেন—কেন ও কথাটা ওর কাছে প্রমাণ করবার জন্য তার এ ব্যগ্রতা? কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ওতে—এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পায় না, অথচ এটাও তার মনে হয়, ও কথা ওকে জানানো একান্ত প্রয়োজন—জীবনের সকল প্রয়োজনই ওর কাছে একান্ত তুচ্ছ।

"না, এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—মনটাকে সংযত করতে হবে।" আরেক গ্লাস ভড্‌কা ঢেলে নিয়ে সে চুমুক দিতে শুরু করল।

ছোট ডিক্যাণ্টারটা নিঃশেষ করে ফেলল সে, ভাবল নেশার ঘোরে সে ভুলে যাবে সব কিছু, তার ব্যর্থ প্রেমের এই বেদনাময় অনুভূতি তাকে আর অস্থির করে তুলবে না। কিন্তু কই, বেদনার উপশম তো হয় না, ক্রমশই যেন তার তীব্রতা বেড়ে চলেছে—একটা নিদারুণ অসহায়তায় মনটা তার বিকল হয়ে আসে।

স্যুপের পাত্রটা একপাশে ঠেলে রেখে সে হুকুম করল এক কাপ কফি এনে দেবার জন্য। কফি হাজির হল টেবিলে। একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে লেফটেনান্ট ভাবতে লাগল কি করে সে এই দুর্নিবার প্রণয়ের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবে—এ যেন তার সমস্ত অন্তরকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে।

ভেবে কোনো উপায় স্থির করা যায় না। বরং যতই ভাবা যায় ততই ব্যাকুলতা বাড়ে। সে বেশ বুঝতে পারে মুক্তি তার অসম্ভব। হঠাৎ টুপী ও ছড়িটা তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে সে উঠে দাঁড়াল, চাকরকে ডেকে জেনে নিল পোস্ট অফিসেব পথটা, তাবপব হোটেল থেকে বেবিয়ে সেইদিকে চলতে শুরু করল। মনে মনে সে সঙ্কল্প করেছে মেয়েটিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে, টেলিগ্রামেব ভাষাটা কি হবে তাবও একটা মক্‌শ করেছে মনে মনে—"এ জীবন এখন সম্পূর্ণ তোমারই, তোমাবই থাকবে আমবণ, যা তোমাব অভিরুচি তাই তুমি কবতে পাবো এ জীবন নিয়ে।"

পোস্ট অফিসে পৌছে সে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। যে শহরে মেয়েটি থাকে তা সে জানে, ওর যে স্বামী ও তিন বছবেব একটি মেয়ে আছে তাও সে জানে, কিন্তু ওব নাম বা পদবী কোনটাই জানে না। গত বাত্রিতে বাব কয়েক সে ওকে নাম জিজ্ঞাসা কবেছিল কথাবার্তার ফাঁকে, কিন্তু প্রতিবাবই ও সহাস্যে জবাব দিয়েছে, "আমার নাম জেনে কি হবে তোমার? আমাব নাম মেরিয়া গ্রীন, ফেয়ারিল্যাণ্ড কুইন··· ও নাম যদি পছন্দ না হয় তবে শুধু অপরিচিতা সুন্দরী বলে ডেকো আমায়···কেমন, তোমাব তো আপত্তি নেই তাতে?"

পোস্ট অফিসের নিকটেই রাস্তাব এক কোণে একটা ফটোগ্রাফেব দোকান। দোকানেব সামনে একটা শো-কেস টাঙানো। একদৃষ্টে সে একখানা ফটো দেখতে থাকে। এক মিলিটাবি অফিসারের ফটো —ঈষৎ উন্নত কপালেব নীচে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ, সুপুষ্ট জমকালো গোঁফ, প্রশস্ত বুক, সর্বাঙ্গে রকমারি তক্‌মা। মনে মনে হাসি পেল তার। কী দুর্বল মানুষেব মন! পবিচ্ছদের আড়ম্বরে দুনিয়াকে তুচ্ছ

করে সে। কী আছে ও সবের মধ্যে যার জন্যে সে গর্ব অনুভব করে? সমৃদ্ধি ও সম্মানের জন্য মানুষের এ ব্যাকুলতা কেন? অন্তরের সুখশান্তির সঙ্গে ওর সম্পর্ক কতটুকু? নববিবাহিত এক দম্পতির ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে সে। লম্বা ফ্রক-কোট ও সাদা নেকটাই-পরা এক যুবক, চুল ছোট করে ছাঁটা, পাশে ওড়নাবৃতা এক তরুণী। কিন্তু সেদিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারে না সে, চট্ করে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নেয় অন্য একটা ছবির দিকে। এ ছবিটি উৎসাহ-দীপ্তা এক সুদর্শনা কিশোরীর, মাথায় টুপী, ছাত্রী বলেই মনে হয়, একপাশে কাৎ হয়ে বসে মধুর হাস্যে দর্শককে অভিবাদন করছে যেন।...তারপর হঠাৎ সে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় পথের দিকে--শো-কেসের দিকে আর চাইতে পারে না। ঐ সব অপরিচিত সুখী নরনারীর প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জাগে মনে। বেশ আছে ওরা—আবর্তহীন স্বচ্ছন্দ জীবন, দুঃখের ধার ধারে না একেবারে।

"কোথায় যাই? কি করি?" বার বার এ প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগে, কিন্তু সমাধানের পথ সে খুঁজে পায় না।

পথ জনশূন্য। দু'পাশের বাড়িগুলি একই ছাদে গড়া, সাদা রঙ, দোতলা, বিশেষ কোন পারিপাট্য নেই—সামনে খানিকটা বাগান, চারিদিক এমন নিস্তব্ধ যে কোথাও মানুষ আছে বলে মনে হয় না। ফুটপাথের উপর ধূলা আর বালির পুরু আস্তরণ, মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে। সব কিছুই উজ্জ্বল প্রাণময় সূর্যালোকে স্নাত, সর্বত্রই আনন্দের দীপ্তি। দূরে পথের ধূসর রেখা দেখা যায়, নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে পথের রেখাটি স্পষ্ট। দক্ষিণের শহরে যেমনটা দেখা যায় এও কতকটা তাই—মনে পড়ে যায় সেবাস্তোপোল, কার্চ... আনাপু-র কথা। শেষোক্ত শহরটির নাম মনে পড়তেই সে কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। মাথা নীচু করে টলতে টলতে সে ফিরে চলে হোটেলের দিকে।

শ্রান্তদেহে সে ফিরে এল হোটেলে। দেহ এমনি ক্লান্ত ও অবসন্ন যে মনে হয় যেন সে এইমাত্র তুর্কীস্থান বা সাহারা থেকে ঘুরে আসছে।

শেষ শক্তিটুকু সংগ্রহ করে সে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরের মধ্যে। নির্জন ঘর খাঁ খাঁ করছে। ঘরটা ইতিমধ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে, মেয়েটির সমস্ত চিহ্ন অপসারিত, শুধু মাথার একটা পিন রয়েছে বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিলের উপর, যা যাবার সময় ভুলে ফেলে গেছে সে। কোটটা খুলে রেখে সে আয়নার দিকে তাকায়। মুখেব চেহারায় কেমন একটা বীভৎসতা, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। ধূলাভরা বুটসুদ্ধ পা দুটো পাদানির উপর রেখে সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খোলা জানলা দিয়ে গরম হাওয়া বইছে আর ঐ হাওয়ায় ভেসে আসছে রৌদ্র-দগ্ধ পথের রকমারি গন্ধ। হাত দুটো মাথাব নীচে রেখে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শূন্যপানে। তাব চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুদূর দক্ষিণের এক স্বপ্নময় ছবি—স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে ছোট্ট শহরটি, সমুদ্র-তরঙ্গেব অবিরাম দাপাদাপি, দূরে দিগন্তলীন বনানীর ধূসর ছায়া। মেয়েটি এতক্ষণে আনাপুতে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই, এতক্ষণে সে হয়তো নিজেকে হাবিয়ে ফেলেছে তাব চিবপরিচিত আবেষ্টনীর মাঝে, ভুলে গেছে তার ক্ষণিক উন্মাদনার কথা। ভাবতে ভাবতে সে তন্ময় হয়ে যায়—মনে হয় ঐ ক্ষুদ্র শহরটি এ জগতের সীমানাব বাইরে, ও যেন কল্পলোকের মায়াপুরী, ওর প্রবেশপথ পৃথিবীর মানুষের কাছে চির-দিনেব জন্য রুদ্ধ। আত্মহত্যার কল্পনা মনের মধ্যে উঁকি মারে—আত্মহত্যা ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ সে খুঁজে পায় না। চোখ বুজে নির্জীবের মতো শুয়ে থাকে সে। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাবপর একসময় চোখে তন্দ্রা আসে নেমে, সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙে যখন সে চোখ মেলে তাকাল তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, সূর্য নেমে গেছে পশ্চিম দিগন্তে।···বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, ঘবের ভিতর বিশ্রী একটা গুমোট। জানলার দিকে চেয়ে লেফটেনাণ্ট চুপ করে শুয়ে থাকে। মনে পড়ে গতরাত্রির কথা, সেদিনের প্রভাতের কথা—কিন্তু উত্তেজনা যেন স্তিমিত হয়ে গেছে, দারুণ একটা অবসাদ মনে। মনে হয় যেন ঐ ব্যাপার সাম্প্রতিক নয়, ঘটে গেছে বহুকাল আগে। আস্তে আস্তে সে উঠে

বসল, তারপর শয্যা থেকে নেমে মুখ হাত ধুয়ে নিল। গরমটা অসহ্য মনে হয়—জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল একপাশে। মিনিট কয়েক চুপচাপ বসে থেকে সে ঘণ্টার আওয়াজ করল, চাকর এসে হাজির হল সঙ্গে-সঙ্গে। হুকুম করল চা আনতে আর সেই সঙ্গে হোটেলের বিল। লেবুর রস মিশানো চা—একটু একটু করে সে পান করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হুকুম করল গাড়ি আনবার জন্যে। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াতেই চাকর মালপত্র উঠিয়ে দিল গাড়িতে। রঙচটা লাল্‌চে গদীর উপর বসে সে পাঁচ রুবল্‌-এর একখানা নোট গুঁজে দিল চাকরের হাতে। স্মিতমুখে অভিবাদন করে বিদায় নিল চাকর।

"কাল রাত্রে আমিই আপনাকে পৌছিয়ে দিয়ে গেছি এখানে। হুজুর হয়তো চিনতে পারছেন না আমাকে।"—গাড়োয়ান বলল একমুখ হেসে।

ঘাটে যখন উপস্থিত হল তারা, তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসছে ভল্‌গার বুকে। নদীর জলে অস্তোন্মুখ সূর্যের লাল আলো ফিকে হয়ে আসছে। স্টীমার এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে—চলন্ত স্টীমারের মাস্তুলে গোধূলির রক্তরেখা।

"ঠিক সময়ে আপনাকে পৌছিয়ে দিয়েছি, হুজুর।" গাড়োয়ান লেফটেনাণ্টের অনুগ্রহ আকর্ষণের চেষ্টা করে। লেফটেনাণ্ট তাকে পাঁচ রুবল্ বখশিস করল, তারপর টিকিট হাতে করে এগিয়ে চলে জেটির দিকে। গতরাত্রির মত তরঙ্গের ছল্ ছল্ শব্দ কানে আসে, তরঙ্গের আঘাতে পায়ের তলাকার লৌহ পাটাতনটা ঈষৎ দুলে ওঠে, পরক্ষণেই শূন্যে নিক্ষিপ্ত মোটা দড়ির একটা প্রান্ত ছিট্‌কে আসে ঘাটে, জেটির গায়ে ধাক্কা দিয়ে স্টীমারটা যায় পিছিয়ে, তার ঘূর্ণমান চাকার নীচে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে প্রচণ্ড গর্জনে। বৈদ্যুতিক আলোয় শোভিত যাত্রীপূর্ণ স্টীমারটা অপেক্ষা করে ঘাটে, সদ্য প্রস্তুত নানাবিধ সুখাদ্যের লোভনীয় গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে স্টীমারের রন্ধনশালা থেকে। মনে হয় যেন সে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে অপেক্ষমাণ জনমণ্ডলীকে।

এক মিনিট পরেই স্টীমার আবার চলতে শুরু করল। সেইদিকেই

সে চলেছে যেদিকে সে রেখে এসেছে সেই রহস্যময়ী সুন্দরীকে—সেদিন প্রভাতে।

সম্মুখে সূর্যাস্তের সম্মোহন দীপ্তি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, নদীর বুকে ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়া।

ডেকে চেয়ারের উপর বসে লেফটেনাণ্ট সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে—পাণ্ডুর মুখ, ক্লান্ত নিষ্প্রভ দৃষ্টি, বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে যেন।

স্বীকারোক্তি

হেরমান জুডারমান (Hermann Sudermann) জার্মান কথাসাহিত্যের দিকপাল-গণের অন্যতম। ১৮৫৭ সালে পূর্ব প্রাশিয়ার Matzicken শহরে ইনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে এঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু দারিদ্র্য এঁর সাহিত্যসাধনার একাগ্রতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ইনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। এঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে Fran Sorge (ইংরাজী অনুবাদে এর নামকরণ হয়েছে Dame Care) ও The Song of Songs সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। দুর্নীতির অজুহাতে The Song of Songs উপন্যাসখানি একসময় নিষিদ্ধ হয়েছিল ইংলণ্ডে। নাটক রচনাতেও ইনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এঁর নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Die Ehre ও Heimat। ১৯২৮ সালে বার্লিনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বক্ষ্যমাণ গল্পে হেরমান জুডারমানের দার্শনিকসুলভ মননশীলতা ও মানবচিত্তের নিগূঢ় রহস্য বিশ্লেষণের অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কর্ত্রীঠাকরুণ, আবার আপনার সান্নিধ্যে এই আরামকেদারায় বসে নিশ্চিন্তমনে যে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উৎসবের কোলাহল গেছে থেমে, অতিথি আপ্যায়নের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমার কাছে একটু বসবার ফুরসৎ হয়েছে আপনার।

এই ক্রিস্টমাস পর্বটা কী বিরক্তিকর! আমার বিশ্বাস এ পর্বটা উদ্ভাবন করেছে শয়তান—আমাদের মত চিরকুমারদের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য। গৃহহীন ছন্নছাড়া জীবনের বেদনা ও রুক্ষতা আমরা যাতে একান্তভাবে উপলব্ধি করি তারই জন্য এ উৎসবের আয়োজন। অপরের কাছে যা অনাবিল আনন্দের উৎস আমাদের কাছে তা দুঃসহ পীড়ন। অবশ্য আমরা যে সবাই নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করি

তা নয়। অপরকে আনন্দ পরিবেশন করে যে আনন্দটুকু পাওয়া যায় আমাদের অনেকেই তা উপভোগ করে থাকে। তবে ঐ আনন্দটুকু প্রায়ই আবিল হয়ে ওঠে কতকটা আত্মসমালোচনার অনিবার্য সংমিশ্রণে আর কতকটা বিবাহিত জীবনের প্রতি উদগ্র লালসায়।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, আমার অন্তরের রুদ্ধ বেদনা এতদিন আপনার কাছে ব্যক্ত করিনি কেন? প্রশ্ন করাটা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, কারণ বেশীর ভাগ নারী যেমন অকৃপণভাবে ঈর্ষার হলাহল বর্ষণ করে থাকে আপনি তেমনি নিঃশেষে বেদনার্তকে উজাড় করে দেন অন্তরের প্রীতি ও সহানুভূতি। কিন্তু ব্যাপারটা আপনি যত সহজ মনে করছেন ঠিক ততটা নয়। স্পাইডেল তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'নিঃসঙ্গ চড়ুই'-এ যা বলেছেন তা আপনি জানেন নিশ্চয়ই। ঐ বইখানিই তো আপনার কাছ থেকে উপহার পেয়েছি এবারের উৎসবে। স্পাইডেল বলেছেন, প্রকৃত চিরকুমার সান্ত্বনা চায় না। একবার সে যখন অসুখী হয়েছে, বেদনাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মেনে নেয় সে বেদনার মধ্যেই রচনা করে কল্পনার স্বর্গ।

স্পাইডেল-বর্ণিত ঐ নিঃসঙ্গ চড়ুই ছাড়া আরেক ধরনের চিরকুমার দেখা যায় যারা কোন না কোন পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আমি অবশ্য তাদের কথা বলছি না যারা বন্ধুত্বের মুখোস পরে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমি বলছি সেই সব চিরকুমারের কথা যারা হয়তো গৃহস্বামীর বাল্যবন্ধু, স্কুলে পড়াশুনা করেছে একসঙ্গে, বন্ধুর শিশুপুত্রটিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে যারা আদর করে পিতৃব্যের স্নেহে, কখনও বা সান্ধ্য পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প বন্ধুপত্নীকে পড়ে শোনায় অশ্লীল অংশগুলি সযত্নে পরিহার ক'রে।

আমি এমন কয়েকটি চিরকুমারকে জানি যারা বন্ধু-পরিবারের পরিচর্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে—যারা সুন্দরী বন্ধুপত্নীর পাশে বসে কাটিয়েছে দিনের পর দিন, অথচ কোনদিনই কোনরকম অসংযত ব্যবহার করেনি, বন্ধুপত্নীর প্রতি যাদের ভালবাসা একান্ত নিষ্কাম।

আমার কথাগুলো আপনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না? বুঝেছি ঐ 'নিষ্কাম' শব্দটায় আপনার আপত্তি। হয়তো আপনার ধারণা অসত্য নয়। অত্যন্ত নিরীহ মানুষেরও মনের মধ্যে কামনা উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু ঐ কামনা প্রকাশ পায় না তার আচরণে—সে তাকে দাবিয়ে রাখে প্রবল চেষ্টায়।

আপনাকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই এবং এবারের নববর্ষের পূর্বদিনে দুটি প্রবীণ ভদ্রলোকের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তারও উল্লেখ করবো, ঐ প্রসঙ্গে। এই আলাপ-আলোচনা আমার কানে এসে পৌঁছুল কি ক'রে সে সম্বন্ধে আপনি কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না এবং আমার অনুরোধ শোনার পর এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। তাহলে আরম্ভ করা যাক—কি বলেন?

কল্পনা করুন একটি উঁচু ছাদবিশিষ্ট ঘর, সেকেলে ধরনের আসবাব-পত্রে সাজানো, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে সবুজ শেড্-লাগানো পালিশ-করা ঝকঝকে একটি ল্যাম্প—কেরোসিনের ব্যবহার প্রচলিত হবার আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-রকম ল্যাম্প ব্যবহার করতেন প্রায় সেই রকম। ল্যাম্পটির মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি গোল টেবিলের উপর। নববর্ষের পানীয়ের যাবতীয় উপকরণ টেবিলের উপর সাজানো—মাঝখানটায় ল্যাম্পের তেল বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে পড়েছে চাদরের উপর।

পূর্বোক্ত প্রবীণ ভদ্রলোক দুটি বসে আছেন 'শেড'-এর অস্পষ্ট ছায়ায়। ওঁরা দুজন যেন কোন প্রাচীন অট্টালিকার শৈবালাচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষ, প্রত্যেকেই আপনার মধ্যে একান্তভাবে নিমগ্ন, প্রত্যেকেই বার্ধক্যের নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছেন। ওঁদের একজন—যিনি গৃহস্বামী—একসময় সৈন্যবিভাগে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পায়ের মোজা, ছুঁচালো গোঁফ আর কুঞ্চিত ভ্রূর রুক্ষতা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। একটা ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে স্থাণুর মত বসে আছেন তিনি—দু'হাত দিয়ে স্টিয়ারিং রডের হাতলটা ধরে। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে নিশ্চল, শুধু নীচেকার চোয়ালটা অবিরাম নড়ছে

চিবানোর ভঙ্গীতে। অপর ভদ্রলোকটী—যিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তির পাশে একখানি সোফায় উপবিষ্ট—দীর্ঘ ও শীর্ণ, কাঁধ অপ্রশস্ত, মুখাবয়বে চিন্তাশীলতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। একটা লম্বা পাইপ তাঁর মুখে—ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। তাঁর মুখের চারিধারে তুষারশুভ্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ওষ্ঠে মৃদু প্রশান্ত হাসি। দেখে মনে হয় যেন স্বার্থপঙ্কিল সংসারের বহু উর্ধ্বে রয়েছেন তিনি—তাঁর অন্তরের শান্তি চির অব্যাহত।

তাঁরা দুজনে বসে আছেন নীরবে। ঘর এমনি নিস্তব্ধ যে ঝুলানো ল্যাম্পের তেল পোড়ার অস্ফুট শব্দ শোনা যায়। দূরে দেওয়াল-সংলগ্ন ঘড়িটায় ঢং ঢং করে এগারোটা বাজে।

"এই সময় তুমি নববর্ষের পানীয় প্রস্তুত করে থাকো প্রতিবারেই," চিন্তাশীল বৃদ্ধটি বললেন বন্ধুকে উদ্দেশ করে। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু ও ঈষৎ কম্পিত।

"হ্যাঁ, নববর্ষের পানীয় প্রস্তুত করবার সময় হয়েছে বটে," অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন গম্ভীরভাবে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুষ্ক ও কঠোর—চিরাভ্যস্ত আদেশের সুর যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"তাঁর অভাবে সবই যে এমন নিরানন্দ হয়ে যাবে একথা ভাবিনি কোনদিন," অতিথি ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন বিষাদের সুরে।

গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিলেন তাঁর কথায় এবং তারপর পূর্বের মতই চোয়াল নাড়তে লাগলেন চিবানোর ভঙ্গীতে।

"চুয়াল্লিশ বার তিনি নববর্ষের সুরা তৈরী করেছেন আমাদের জন্য," অতিথি পুনরায় বলতে শুরু করলেন।

"হ্যাঁ," বৃদ্ধ সৈনিক বললেন একটু অন্যমনস্কভাবে, "আমার বার্লিনে আসার পর থেকেই।"

"গত বৎসরও এমনি সময় আমরা তিনজন ছিলাম একত্র আর কী আনন্দেই না কাটিয়েছিলাম সময়টা!" অতিথি বলতে থাকেন গাঢ় শ্লথকণ্ঠে—"ঐ আরাম-কেদারাটির ওপর বসে তিনি মোজা বুনছিলেন পলের বড় ছেলেটির জন্য—তাঁর আঙুলগুলি চলছিল অতি দ্রুত।

বারোটা বাজবার আগেই বোনাটা শেষ করবেন এই ছিল তার সঙ্কল্প আর সে সঙ্কল্প রেখেও ছিলেন তিনি। তারপর নববর্ষের সুরা পান ক'রে আমরা পরম স্বচ্ছন্দচিত্তে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম। আশ্চর্যের বিষয় দু'মাস পরেই মৃত্যুর রাজ্যে যাত্রা করলেন তিনি। তুমি জানো, আমি একখানা বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলাম আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে। তুমি আমার মত কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারোনি। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমারও মত গেছে বদ্‌লে—আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমার আর এখন বিশেষ আস্থা নেই। বলতে কি, কোনো চিন্তা বা কল্পনার উপর আমি আর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করি না।"

"হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভাল ছিল সে," মন্তব্য করলেন মৃতার স্বামী, "আমার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার। ভোর পাঁচটায় আমায় যখন কাজে বেরুতে হত, প্রতিদিনই আমার ঘুম ভাঙার আগে সে বিছানা ছেড়ে উঠে আমার জন্যে ভালো করে এক কাপ কফি বানিয়ে দিত। তবে তার দোষ ত্রুটি যে না ছিল এমন নয়। একবার সে যেই তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করতে শুরু করল, ওঃ···তার সেই অর্থহীন অবিশ্রান্ত প্রলাপ···"

"তুমি তাঁর কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারতে না, তাই ওকথা বলছ," মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করেন অতিথি ভদ্রলোকটি। নিরুদ্ধ ক্রোধের আবেগে তাঁর ঠোঁটের প্রান্তভাগ ঈষৎ কেঁপে উঠল, যদিও বন্ধুর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিবাদের লক্ষণ দেখা গেল না। শান্ত করুণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, মনে হল যেন তাঁর মনের গোপন কোণে পাপের ছায়া ঘোরাফেরা করছে সন্তর্পণে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, "শোনো ফ্রাঞ্জ, একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই। মনের ওপর আমার একটা বোঝা চেপে রয়েছে অনেকদিন থেকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোঝাটা বহন করা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। আজ সব কথা তোমাকে অকপটে বলে মনটাকে হাল্‌কা করতে চাই।"

চেয়ারের একপাশে রাখা লম্বা পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে তামাক ভরতে ভরতে ফ্রাঞ্জ বললেন, "বেশ, তবে বলে যাও।"

"একসময় তোমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছিল···"

"দেখো ডাক্তার, রহস্য ক'রো না," ফ্রাঞ্জ বললেন বন্ধুর দিকে চেয়ে।

"আমি মোটেই রহস্য করছি না। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল এ ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। নিদারুণ অশান্তি ভোগ করেছি আমি। এখন সেটা ব্যক্ত করে মনটাকে আমি ভারমুক্ত করতে চাই।"

"তুমি কি বলতে চাও আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?" বৃদ্ধ সৈনিক চেঁচিয়ে উঠলেন উগ্রকণ্ঠে।

"ছিঃ, তুমি ও কথা বলছ!" ম্লান হাসি হেসে বিষাদ-মাখানো কণ্ঠে বললেন দার্শনিক বন্ধু।

ফ্রাঞ্জ বিড় বিড় করে কি বলে পাইপটা ধরালেন।

"না, তিনি ছিলেন দেবদূতের মতই পবিত্র," দার্শনিক বন্ধুটি বলতে লাগলেন, "আমরা দুজন হলাম পাপাচারী। শোনো তাহলে সব কথা। তেতাল্লিশ বছর আগেকার ব্যাপার বলছি। তোমাকে সবে বার্লিনে বদলি করা হয়েছে, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। সে সময় তুমি কি রকম উচ্ছৃঙ্খল ছিলে তা হয়তো তোমার স্মরণ আছে।"

"হুঁ।" কম্পিত হাতখানা তুলে ফ্রাঞ্জ গোঁফের প্রান্তভাগ পাকাতে লাগলেন।

"সেসময় বার্লিনে একটি সুন্দরী অভিনেত্রী ছিল যার চোখ দুটি ছিল ভোমরার মত কালো আর টানা টানা এবং দাঁতগুলি ছিল মুক্তার মত সাদা আর ছোট ছোট। তোমার মনে পড়ে কি?"

"হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে। বিয়ান্‌কা তারনাম।" একটা ক্ষীণ হাসি বৃদ্ধ সৈনিকের রুক্ষ কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে খেলে গেল, "মেয়েটি কী দুষ্টুই ছিল! বিশ্বাস করো আমাকে, কামড়ে দিতেও সে দ্বিধা করতো না।"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রতারিত করেছিলে, তোমার স্ত্রীও তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কোনো অনুযোগ করতেন না, নীরবে এ বেদনা সহ্য করতেন। তুমি ওটা লক্ষ্য করোনি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম। মা'র মৃত্যুর পরে তিনিই প্রথম নারী যাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি আমার জীবনে এসেছিলেন উজ্জ্বল তারকার মত—মহত্তর জীবন যাপনের প্রেরণা পেয়েছি তাঁরই কাছ থেকে। অবশেষে আমি একদিন সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সাম্প্রতিক ভাবান্তরের কারণ কী। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন শরীরটা তাঁর তেমন ভাল নেই। তোমার হয়তো স্মরণ আছে ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্বে পলের জন্ম হয়েছিল। তারপবে এল নববর্ষের পূর্বদিনটি—ঠিক তেতাল্লিশ বছর আগেকার এই রাত্রি। প্রতিদিনকাব মত সেদিনও আমি তোমাদের বাড়ি এসেছিলাম রাত্রি আটটা নাগাদ। তোমার স্ত্রী চেয়ারে বসে কাপড়ের উপব ছুঁচের কাজ করছিলেন আর আমি তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম। আমরা তোমাব আগমনেব অপেক্ষা করছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, কিন্তু তোমার দেখা নেই। আমি লক্ষ্য করলাম, তোমাব স্ত্রী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছেন আর তাঁর সর্বশরীর থর থর কবে কাঁপছে—আমারও সারা দেহ কেঁপে উঠল। কেন যে তুমি আসতে পাবছ না তা আমি জানতাম এবং আমার ভয় হল সেই মায়াবিনী অভিনেত্রীর বাহুবন্ধনে তুমি হয়তো বারোটা বাজার কথা একেবারেই ভুলে যাবে। বারোটা বাজতে আর দেরী নেই—ঘড়িব কাঁটা এগিয়ে আসছে। তোমার স্ত্রী হাতের কাজ বন্ধ করলেন, আমিও পড়া বন্ধ কবলাম, এক ভয়াবহ স্তব্ধতা যেন নেমে এল ঘরের মধ্যে। আমি লক্ষ্য করলাম, একবিন্দু অশ্রু তাঁর চোখের পাতার মধ্যে টলটল করছে, তারপর গাল বেয়ে গড়িয়ে হাতের বোনাটার উপর পড়ল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—ইচ্ছা, ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনি। ঐ ছলনাময়ী নারীর কবল থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনবার ক্ষমতা আমার আছে এ আমি বেশ অনুভব করলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার স্ত্রীও লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। এখন আমি যে আসনে বসে রয়েছি এইটেতেই বসেছিলেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর মুখে অব্যক্ত ভয় ও বেদনার ছাপ।

'ফ্রাঙ্ককে আনতে,' জবাব দিলাম আমি।

কথাটা শুনে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এলেন তিনি।

'দোহাই আপনার, এখানে থাকুন খানিকক্ষণ। আমাকে একলা ফেলে যাবেন না।' কথাটা বলতে বলতে তিনি আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কাঁধের উপর হাত দুটি রেখে অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মাঝে লুকিয়ে ফেললেন। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থর থর করে। এর আগে কোনদিন কোন নারীর এত নিকট সান্নিধ্য আমি অনুভব করিনি। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে রাখলাম এবং তাঁকে শান্ত করবার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। সত্যি, সান্ত্বনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলে তুমি। আমার মুখের অবস্থা তখন কী হয়েছিল তুমি লক্ষ্য করনি। তোমার গণ্ডদেশ অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছিল এবং তোমার দুই চোখ প্রেমের মাদকতায় বুজে আসছিল যেন

সেবার নববর্ষের পূর্বদিনের ঘটনা আমার মনে এমন একটা পরিবর্তন নিয়ে এল যাতে আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। তাঁর সুকোমল বাহুর স্পর্শ ও নিবিড় কেশপাশের সুমধুর সুবাস অনুভব করার পর থেকে মনে হল যেন আমার সেই উজ্জ্বল তারকা চিত্তাকাশ থেকে খসে পড়েছে আর তার স্থানে দেখা দিয়েছে এক প্রেমময়ী নারী তার অতুল রূপলাবণ্য নিয়ে। আমি বুঝতে পারতাম আমার দৃষ্টিতে এখন প্রেমের আবেদন ফুটে উঠেছে এবং মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করতাম হীন প্রতারক বলে। বিবেকের গঞ্জনা থেকে কতকটা নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে আমি চেষ্টা করলাম তোমার প্রণয়িনীর কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে। সৌভাগ্যক্রমে

আমার হাতে তখন কিছু অর্থও ছিল যা আমি পেয়েছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে। আমি সেই অর্থ যখন সেই কুহকিনীকে দিতে চাইলাম তার সাহায্যের প্রত্যাশায়, সে তা প্রত্যাখ্যান করল না আর···"

বৃদ্ধ সৈনিকটি বাধা দিয়ে বললেন, "ও, তাহলে তুমিই বিয়ান্‌কার সেই মর্মান্তিক চিঠির জন্য দায়ী যাতে সে আমায় ভগ্নহৃদয়ে বিদায় জানিয়েছিল জন্মের মত ?"

"হ্যাঁ, আমিই তার জন্য দায়ী। কিন্তু শোনো—আরও কিছু বলতে চাই আমি। ভেবেছিলাম, আমি তাঁকে যে অর্থ দিলাম তার বিনিময়ে শান্তি ফিরে পাবো। কিন্তু সে আমার ভুল। ঐ সব অসংযত চিন্তা দিনের পর দিন প্রবল হয়ে আমার মনে বাসা বাঁধতে লাগল। নিরুপায় হয়ে আমি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। ঠিক সেই সময় আমি আমার গ্রন্থ 'আত্মার অবিনশ্বরতা'র মূল বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা করি। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। শান্তি এল না মনে।

এইভাবে পূর্ণ এক বৎসর কেটে গিয়ে আবার নববর্ষের পূর্বদিনটি এসে হাজির হল। আবার তাঁর পাশটিতে এসে বসলাম এই চেয়ারের উপর। এবার বাড়ি ছিলে তুমি, কিন্তু ক্লাবে আমোদ-প্রমোদ ক'রে ক্লান্ত হয়ে সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে পাশের ঘরে। তাঁর খুব নিকটে বসে তাঁর সেই পাণ্ডুর সুডৌল মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গতবারের নববর্ষের পূর্বদিনটির স্মৃতি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ভেসে উঠল এবং আমার হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। আর একবার আমার কাঁধে তাঁর সুচিক্কণ কেশদামের স্পর্শ অনুভব করবার জন্য, আর একটিবার তাঁকে চুম্বন করবার জন্য মন আমার মাতাল হয়ে উঠল। পরিণাম যাই হোক না কেন, সেদিকে আমার তখন ভ্রূক্ষেপ নেই। মুহূর্তের জন্য আমাদের দৃষ্টিবিনিময় হল। তাঁর চোখ দেখে মনে হল যেন তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে আমার উত্তপ্ত মুখখানা তাঁর কোলের মধ্যে গুঁজে দিলাম।

এইভাবে নিশ্চল হয়ে আমি পড়েছিলাম সম্ভবত দু'তিন সেকেণ্ড। হঠাৎ তাঁর কোমল হস্তের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম মাথায়। শান্ত সহজ স্বরে তিনি বললেন, 'আপনাকে ভালো হতে হবে—মনকে দুর্বল করবেন না।'

হ্যাঁ, আমাকে ভালো হতে হবে। আমার বন্ধু যে আমায় একান্ত-ভাবে বিশ্বাস করে পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে—তাকে আমি কিছুতেই প্রতারিত করতে পারি না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং উদ্বিগ্ন-ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে এনে আমার হাতে তিনি দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে আমার দেরী হল না। বইখানা তাড়াতাড়ি খুলে আমি চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কী যে পড়ছিলাম তা জানি না!

অক্ষরগুলো যেন আমার চোখের সামনে নাচতে লাগল। কিন্তু আমার মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছিল ধীরে ধীরে তা শান্ত হয়ে এল। যখন বারোটা বাজল আর তন্দ্রাজড়িত চোখে তুমি উঠে এলে আমাদের নববর্ষের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে, তখন মনে হল যেন আমার পাপের মুহূর্ত বহু দূরে বিস্মৃত অতীত যুগের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।

সেইসময় থেকে আমার মন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। আমি বুঝেছিলাম, আমার ভালবাসায় তিনি সাড়া দেননি এবং তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই আমি প্রত্যাশা করতে পারি না। বছরের পর বছর কেটে গেল। তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হল এবং বিবাহ করে সংসারী হল। আমরা তিনজন বার্ধক্যের দ্বারে এসে পৌঁছুলাম। উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করে একটিমাত্র নারীকেই তুমি আশ্রয় করলে—আমারই মত। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করতে পারলাম না আমি। সেটা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু আমার ভালবাসা অন্য রূপ নিল। পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সংস্রব কাটিয়ে সে ভালবাসা এক আধ্যাত্মিক মিলনে রূপান্তরিত হল। তোমার স্ত্রী ও আমি যখন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতাম

তখন তুমি প্রায়ই উপহাস করতে। কিন্তু তুমি যদি বুঝতে পারতে আমার আত্মা একীভূত হয়ে গেছে তাঁর আত্মার সঙ্গে, তবে নিশ্চয়ই তোমার মনে ঈর্ষা দেখা দিত। এখন তিনি পরলোকে, হয়তো আগামী নববর্ষের পূর্বদিনটির আগেই আমরাও তাঁর অনুসরণ করবো। সেইজন্যেই ভাবলাম মনের গোপন কথাটা তোমার কাছে ব্যক্ত করে, মনটাকে হাল্কা করে নেওয়ার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়।—ভাই ফ্রাঞ্জ, আমি তোমার প্রতি একদিন অন্যায় আচরণ করেছি······আমায় ক্ষমা করো।"

অনুনয়ের ভঙ্গীতে তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুর দিকে, কিন্তু ফ্রাঞ্জ সহজ সুরে বললেন, "কী যে বলছ! এর ভেতর ক্ষমা করবার আছে কী? তোমার এই কাহিনী, এই স্বীকৃতি নিতান্ত পুরানো। এ আমি জানি অনেক কাল! সে নিজেই এ ঘটনা আমায় সবিস্তারে বলেছিল চল্লিশ বছর আগে। এবার আমি বলবো কেন আমি বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নারীর পিছনে ঘুরেছি। সে আমায় বলেছিল— যখন তোমার সম্পর্কিত ব্যাপারটা জানায়—যে জীবনে সে একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছে—আর কাউকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অতিথি-বন্ধু নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেওয়ালে সংলগ্ন ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে উঠল।

জীবন্ত সমাধি

এ গল্পের রচয়িতা এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মার্কিন সাহিত্যিকদের অন্যতম। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়নের পর ইনি West Point-এর সামরিক শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই পারিবারিক কারণে উক্ত শিক্ষালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ইনি পরে সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। Baltimore Saturday Visitor কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক গল্প-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসাবে ইনি একশো ডলার পুরস্কার লাভ করেন। গল্পে রহস্য ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার শক্তি এঁর অসাধারণ। ইংরেজ মহিলা-কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ও তাঁর স্বামী বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং পো-র অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

মানুষের অদৃষ্টে যত রকমের দুর্ভোগ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ জীবন্ত সমাধি। এ দুর্ভোগ যে অনেকের অদৃষ্টে ঘটেছে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনো অস্বীকার করবেন না। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে ব্যবধান, তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কোথায় যে একের শেষ ও অপরের আরম্ভ তা কে বলতে পারে? আমরা জানি এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে যাতে জীবনের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, অথচ মৃত্যু ঘটে না—দেহযন্ত্রের ওই বিকলতা সাময়িক মাত্র। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর এক রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি অচল যন্ত্রকে পুনরায় সচল করে তোলে।

চেতনার সাময়িক বিলোপের ফলে যে অকাল সমাধি ঘটবে এ আর বিচিত্র কি? তা'ছাড়া এমন অনেক ঘটনা আমরা জানি যার দ্বারা সহজে প্রমাণিত হয় যে, বহু নরনারীর অকালে সমাধি হয়েছে। পাঠকদের হয়তো স্মরণ আছে, কিছুদিন আগে বাল্‌টিমোর শহরে

একজন নারী অকালে সমাধিস্থ হয়েছিল। এ ঘটনায় সারা শহরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শহরের এক খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীর স্ত্রী হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করতে অসমর্থ হন। কয়েকদিন দারুণ যন্ত্রণাভোগের পর মহিলাটির মৃত্যু ঘটে। কেউই সন্দেহ করতে পারেনি যে, তাঁর ওই মৃত্যু সত্যকারের মৃত্যু নয়, কেননা।মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ তাঁর দেহে ফুটে উঠেছিল। মুখ রক্তহীন, চক্ষু নিষ্প্রভ, দেহে উত্তাপের লেশমাত্র ছিল না—নাড়ীর গতিও স্তব্ধ। তিনদিন দেহ সমাধিস্থ করা হল না—এই সময়ের মধ্যে দেহ পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। তারপর মনে হল যেন দেহ পচতে শুরু করেছে—কাজেই আর দেরী না করে সমাধির আয়োজন করা হল।

মহিলাটির দেহ রক্ষিত হল তাঁদের পারিবারিক শবাগারের মধ্যে। তিন বৎসর কেউ আর সেখানে প্রবেশ করেনি। ওই সময়ের পর পাথরে তৈরী একটি কফিন রাখবার জন্যে শবাগারের দরজা যখন খোলা হল, তখন এক অভূতপূর্ব ঘটনায় সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দরজা খুলেছিলেন মহিলার স্বামী—দরজা খুলতেই সাদা কাপড়ে ঢাকা কি একটা পদার্থ সশব্দে তাঁর হাতের উপর পড়ল। লক্ষ্য করে দেখেন, বাহুবন্ধনে যা ধরা দিয়েছে, সেটি তাঁর স্ত্রীর কঙ্কাল—দেহে তখনো শবাচ্ছাদনের বস্ত্র বর্তমান।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, সমাধির কিছুকাল পরেই মহিলাটি সম্ভবত চেতনা ফিরে পান। চেতনা ফিরে পেতে শবাধার থেকে বেরুবার তিনি চেষ্টা করেন। তার ফলে শবাধারটি শেল্‌ফের উপর থেকে মেঝেয় পড়ে যায়। তৈলপূর্ণ একটি আলো বাহকেরা সমাধিস্থানে ফেলে গিয়েছিল—দেখা গেল, তার তৈল নিঃশেষ। ভিতরে নামবার সোপানশ্রেণীর উপর ভগ্ন শবাধারের একটি বৃহৎ টুকরো পড়ে রয়েছে। মনে হয় যেন তিনি ওই কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে লৌহদ্বারে আঘাত করে বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। আঘাত করবার সময় ভয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হন অথবা তাঁর মৃত্যু হয়। মাটিতে

পড়বার সময় তাঁর দেহলগ্ন বস্ত্র হয়তো দরজার হাতলের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

বেশীদিনের কথা নয়, ফ্রান্সের এক পল্লীগ্রামেও এক হতভাগিনী নারী জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত হয়েছিল। ঘটনাটির বিবরণ শুনে প্রত্যেকেরই মনে হবে, বাস্তব কল্পনার চেয়েও বিচিত্র! এ আখ্যায়িকার নায়িকা ভিক্তরীন্ লাফুর্কেদ নাম্নী সম্ভ্রান্তবংশীয়া এক সুন্দরী তরুণী। তার অগুনতি পাণিপ্রার্থীর মধ্যে ছিল প্যারি-র এক দরিদ্র সাহিত্যসেবী —নাম জুলিয়েন্ বোসুয়েৎ। তার সাহিত্যিক প্রতিভা ও মধুর স্বভাব ওই রূপবতী তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তরুণী তাকে ভালবাসত মনে মনে, কিন্তু আভিজাত্যের গর্বে শেষটা তাকে সে প্রত্যাখ্যান করে এবং একজন ধনী ব্যবসাদারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। বিবাহের পর ওই ভদ্রলোক—মঁসিয়ে রেনেল—তাকে অবহেলা করতে শুরু করেন এবং দিনের পর দিন স্ত্রীর প্রতি তাঁর আচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। অতি কষ্টে স্বামীর সঙ্গে কয়েক বছর কাটাবার পর তরুণী মারা গেল। অন্তত তার অবস্থা দেখে সকলেই অনুমান করল যে, তার মৃত্যু হয়েছে। যথাসময়ে তাকে সমাধিস্থ করা হল—শবাগারের মধ্যে নয়, পল্লীর সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে। দয়িতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বোসুয়েৎ অত্যন্ত মর্মাহত হল। রাজধানী ছেড়ে সে যাত্রা করল সেই সুদূর পল্লীর উদ্দেশে—যেখানে তার প্রণয়িনীর দেহ সমাহিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, কবর থেকে প্রিয়তমার শব তুলে তার সুকোমল কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করবে। প্রিয়তমার মধুর স্মৃতিকে সে চায় অক্ষয় করে রাখতে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর সমাধির কাছে সে উপস্থিত হল। গভীর নিশীথে অতি কষ্টে ভূগর্ভ হতে শবাধার সে তুলল, তারপর ডালাটা খুলে শবের চুল কাটতে শুরু করল। মাথায় করস্পর্শ হতেই মৃতা চোখ মেলে চাইল। বিস্মিত প্রণয়ী প্রথমে প্রিয়তমার মুখের পানে চেয়ে রইল বিহ্বল নেত্রে—তারপর তার দেহ কাঁধের উপর ফেলে দ্রুতপদে তার বাসস্থানে ফিরে এল। গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে, গোপনে সে তরুণীর শুশ্রূষা করতে

আসল। তার যত্ন ও সেবার ফলে তরুণী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল। প্রণয়ীকে চিনতে পারল সে। পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সে বোস্যুয়েতের কাছেই রইল। ক্রমশ বোস্যুয়েতের প্রতি মন তার আকৃষ্ট হল। বোস্যুয়েৎ তার অকপট প্রেমের যে পরিচয় দিয়েছে, তাতে তার নারীচিত্ত দ্রবীভূত হল। স্বামীর কাছে সে আর ফিরে গেল না এবং সে যে পুনর্জীবন পেয়েছে একথা তাঁর কাছে গোপন কবে প্রণয়ীর সঙ্গে পালিয়ে গেল সুদূব আমেরিকায়। বিশ বছর পরে তারা ফ্রান্সে ফিরে এল। ভাবল, দীর্ঘকালের ব্যবধানে ভিক্তরীনকে কেউ আর চিনতে পাববে না। কিন্তু তাদের অনুমান মিথ্যা হল। প্রথম সাক্ষাতেই মঁসিয়ে রেনেল স্ত্রীকে চিনতে পেরে দাবী করলেন। ভিক্তরীন্ তাঁর দাবী মানতে চাইল না এবং অবশেষে রেনেল যখন বিচাবালয়ের শবণাপন্ন হলেন, তখন বিচারকেবাও ভিক্তবীনেব পক্ষ সমর্থন করলেন। ভিক্তরীনেব পুনর্জীবন লাভের বিচিত্র ঘটনাব উল্লেখ কবে তাঁরা মত প্রকাশ করলেন, ভিক্তবীনের উপব স্বামীব অধিকার চিবদিনের মত লুপ্ত হয়েছে।

এ রকমেব বহু ঘটনা অনায়াসে উপস্থিত করা যেতে পারে, কিন্তু তা আমরা কবতে চাই না, কারণ অকালে যে অনেকেব সমাধি ঘটে তা প্রমাণ করবাব কোন প্রয়োজন নেই। মৃত্যুর প্রকৃতি নির্ণয় কববাব শক্তি যখন আমাদেব নেই, তখন আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, জীবন্ত সমাধি প্রায়ই ঘটে আমাদের অজ্ঞাতসারে। গৃহ নির্মাণের জন্যে বা অন্য কোন কারণে যখনই কোন সমাধিভূমি অধিকার করা হয়, তখনই ভূগর্ভে এমন সমস্ত কঙ্কালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাদের অবস্থিতির বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে এক ভীষণ সন্দেহের সৃষ্টি করে।

ভীষণ এ সন্দেহ, কিন্তু আরো ভীষণ সমাহিতের পরিণতি! মৃত্যুর পূর্বে সমাহিত হওয়া যে পরিমাণ দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাব সৃষ্টি করতে পারে এমন আর কিছুই পারে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের দুঃসহ যাতনা, সিক্ত মৃত্তিকার বিষাক্ত বাষ্প, বায়ুহীন সঙ্কীর্ণ আবাসের কঠিন আলিঙ্গন, সীমাহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, গভীর সর্বগ্রাসী স্তব্ধতা

—এ সব অনুভূতির সঙ্গে মনের মধ্যে জাগে উন্মুক্ত আকাশ ও প্রান্তরের ছবি—অন্তর ব্যাকুল করে তোলে প্রিয়তম বন্ধুদের স্মৃতি—ভাবি, আমাদের এই পরম দুর্দশার কথা জানতে পারলে ব্যাকুল হয়ে তারা ছুটে আসবে আমাদের বাঁচাবার জন্য—কিন্তু একথাও সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়, আমাদের এই দুর্ভাগ্যের বার্তা কোনদিনই পৌঁছবে না তাদের কাছে—আমাদেব সামান্য শক্তিটুকুও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে মৃত্যুর নির্মম পীড়নে! সত্যই যারা মৃত, তাদের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যেব পার্থক্য থাকে না এতটুকু।... এ সব চিন্তা মনের মধ্যে বেদনাময় এমন এক ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলে যে অতি দুর্বার কল্পনাও আর অগ্রসব হতে পাবে না—ভয়ে পিছিয়ে আসে! এরকম বীভৎস আর কিছু পৃথিবীতে আছে বলে জানি না, নরকেও কল্পনা করা দুরূহ। তাই এ সম্বন্ধে সমস্ত কাহিনী মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট কবে; তবে এ আকর্ষণ নির্ভর করে বর্ণিত বিষয়েব সত্যতায় আমাদের অকুণ্ঠিত বিশ্বাসেব উপব। এখন আমি যা বলতে যাচ্ছি তা আমাব ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা—সুতরাং এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পাবে না।

কয়েক বৎসব ধবে আমি এক অদ্ভুত ব্যাধিতে ভুগছিলাম। চিকিৎসকেবা এব নাম দিয়েছেন ক্যাটালেপ্‌সি—অন্য কোন নামে একে নির্দিষ্ট কবতে না পেরে। যদিও এ বোগের প্রত্যক্ষ কারণ আজও রহস্যাবৃত, এব বাহ্যিক লক্ষণ সহজেই ধরা যায়। রোগের স্থিতিকাল সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। কখনো কখনো রোগী একদিন বা আবও অল্প সময়ের জন্যে মূর্চ্ছিত হয়ে থাকে। চেতনা লুপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থিব, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন তখনো ক্ষীণভাবে অনুভূত হয়, সামান্য উত্তাপ তখনো অবশিষ্ট থাকে, গণ্ডদেশে তখনো রক্তের অস্পষ্ট আভা দেখা যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদু ও অনিয়মিত—শ্বাসযন্ত্র যে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়েনি তা শুধু বোঝা যায় রোগীর ঠোঁটের সামনে আয়না এনে ধরলে। তারপর রোগের স্থিতিকাল বাড়ে। রোগী দু'চার সপ্তাহ মূর্চ্ছিত হয়ে থাকে—কখনো

বা দু'চার মাস। শেষে রোগীর এমন অবস্থা ঘটে যে সে জীবিত কি মৃত বোঝবার কোন উপায়ই থাকে না। রোগীর আত্মীয়স্বজন তার রোগের ইতিবৃত্ত জানে বলেই অকাল সমাধি থেকে সে রক্ষা পায়। সৌভাগ্যের বিষয় রোগের বৃদ্ধি অতি ধীর ও ক্রমিক। রোগের প্রত্যেক আক্রমণ পূর্ববারের আক্রমণের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং রোগ যতই পুরাতন হয়, ততই তার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণেই রোগী যখন স্থির নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে, তখন তাকে সমাহিত করবার জন্যে কারো ব্যস্ততা দেখা যায় না। যে হতভাগ্যের দেহে রোগের প্রকোপ প্রথমেই প্রবলভাবে দেখা দেয়, তার অদৃষ্টে অকাল সমাধি অনিবার্য।

ডাক্তারী গ্রন্থে এ রোগের যে-সব বিবরণ চোখে পড়ে, তার সঙ্গে আমার পীড়ার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কখনো কখনো স্পষ্ট কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আমি অবসন্ন হয়ে পড়তাম। ···দেহে কোন যন্ত্রণা হত না বটে, তবে হাত-পা নাড়ার শক্তি চলে যেত···মস্তিষ্কও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ত, ভাবতে পারতাম না কিছু···আমি যে জীবিত আর আমার শয্যাপার্শ্বে আমার আত্মীয়-স্বজন উপবিষ্ট, শুধু এইটুকু অনুভব করতাম অস্পষ্টভাবে। এই-ভাবে কিছুকাল থাকার পর একসময় আমার চেতনা ফিরে আসত নিতান্ত আকস্মিকভাবে। আবার কখনো বা রোগের আক্রমণ হত অতি প্রবল ও দ্রুত। হঠাৎ দুর্বল ও অবসন্নভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়তাম মূর্চ্ছিত হয়ে। তারপর দু'চার সপ্তাহ সবই শূন্য ও অন্ধকার —জগতের কোন অনুভূতিই আর থাকত না।

শেষোক্ত আক্রমণের পর চেতনা ফিরে আসতে সময় লাগত বেশী। চেতনা ফিরে পেতাম অতি ধীরে—শীতের দীর্ঘ রাত্রির শেষে গৃহহীন নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের কাছে প্রভাতের আলো যেমন অলস ক্লান্তভাবে ফুটে ওঠে, তেমনি ধীরে চেতনা জেগে উঠত মূর্চ্ছিত অন্তরের মাঝে।

যদিও এ ব্যাধির আক্রমণে প্রায়ই আমি ভুগতাম, এর জন্যে

আমার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে এটা আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, আমার ঘুমের প্রকৃতিটা যেন বদ্‌লে গেছে। জেগে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বেশ সজাগ হয়ে উঠত না, কয়েক মিনিট আমি পড়ে থাকতাম মুহ্যমানের মত—আমাব মানসিক বৃত্তিগুলি, বিশেষ করে আমার স্মৃতিশক্তি যেন তখন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

যা কিছু কষ্ট অনুভব কবতাম, সবই মানসিক। তবে সে মানসিক কষ্টের তুলনা নেই। মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতে পারতাম না। মৃত্যুর কথা সর্বদা আলোচনা করতাম, মৃত্যুর চিন্তায় সহজেই তন্ময় হয়ে পড়তাম। অকাল-সমাধির ভয় দিবারাত্র আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। সে-ভয়ের পীড়ন দিনের চেয়ে রাত্রিতে হত বেশী। রাত্রির অন্ধকাব পৃথিবীব বুকে যখন ছড়িয়ে পড়ত, তখন আমার সারা দেহ ভয়ে কাঁপতে শুরু করত। চোখে ঘুম এলেও চোখ বুজতে পারতাম না—যখন আর জেগে থাকা সম্ভব হত না, তখন নিতান্ত অনিচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়তাম—কারণ আমার ভয় হত, হয়তো জেগে উঠে দেখবো আমি ভূগর্ভে বন্দী। এবং ঘুমিয়ে পড়তে না পড়তেই নানা বীভৎস স্বপ্ন এসে মনেব মাঝে বিভীষিকা স্বষ্টি করত।

যে-সব ভয়ঙ্কব স্বপ্ন ঘুমেব মাঝে আমাকে পীড়িত কবত, তাদের মধ্যে একটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি। মনে হল যেন আমি দীর্ঘকাল মূর্চ্ছিত হয়েছি। হঠাৎ কপালে কাব তুষাব-শীতল হস্তের স্পর্শ অনুভব করলাম এবং কে যেন মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কানেব কাছে বলল, 'ওঠো'।

আমি উঠে বসলাম। চাবিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। যে আমায় জাগালো তার আকৃতি দেখতে পেলাম না। কখন যে আমি মূর্ছিত হয়েছি এবং কোথায় যে তখন আছি, কিছুই স্মরণ করতে পারলাম না। চুপ করে বসে যখন আমি বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে জড়ো করবার চেষ্টা করছি, সেই সময় সেই শীতল হাতখানা জোরে

আমার কব্জি চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বের সেই স্বর শুনতে পেলাম—সে বলছে, 'ওঠো, আমার আদেশ অমান্য করছ কেন ?'

'কে তুমি ?' ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

'যে রাজ্যে আমার বাস, সেখানে আমার কোন নাম নেই।' অদৃশ্য মূর্তি বিষাদের সুরে বলল, 'একসময় ছিলাম মানুষ, এখন হয়েছি কায়াহীন প্রেত। দয়া-মমতা আমার নেই, আমি নিষ্ঠুর, কিন্তু মন আমার এখনো বেদনার অনুভূতি হারায়নি। আমি যে ভয়ে কাঁপছি, তুমি তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। কথা কইতে আমার দাঁত-গুলো ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ করছে—জেনো এ শীতের জন্যে নয়, ভয়ের আতিশয্যে। বাস্তবিক, এ ভয়াবহ দৃশ্য অসহ্য! তুমি কেমন করে এমন আরামে ঘুমোও জানি না। তুমি কি ঐ মর্মভেদী আর্তনাদ শুনতে পাও না? আমি অস্থির হয়ে উঠেছি!…ওঠো, এস আমার সঙ্গে—কবরের ভেতরকার দৃশ্য তোমাকে একবার দেখাই। কী ভীষণ, কী করুণ সে দৃশ্য!'

অদৃশ্য মূর্তি হাত ধরে আমায় এগিয়ে নিয়ে চলল। খানিক পরে চোখ মেলে দেখি, হঠাৎ কে যেন সমস্ত কবর উন্মুক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেকটার ভেতর থেকেই ক্ষীণ আলো নির্গত হচ্ছে। সেই আলোয় কবরের নিভৃততম প্রদেশও আমার দৃষ্টিগোচর হল। দেখলাম, বস্ত্রাবৃত অসংখ্য দেহ গভীর সুপ্তিমগ্ন। কিন্তু হায়, সত্যই যারা সুপ্ত, তাদের সংখ্যা সুপ্তিহীনের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। যারা সুপ্তিহীন তাদের দেহ মাঝে মাঝে নড়ছে—মনে হচ্ছে যেন তারা ঐ বস্ত্রের আবরণ ত্যাগ করে বাইরে আসবার জন্যে ব্যাকুল। চারিদিকে ব্যথা ও বেদনার দুঃসহ কাতরতা। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য কবর থেকে সমাহিতদের আচ্ছাদন-বস্ত্রের মৃদু খস্ খস্ শব্দ ভেসে আসছে। যারা শান্তিতে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে, দেখলাম তাদের মধ্যেও অনেকে চিত হয়ে শুয়ে নেই—যেভাবে তাদের সমাহিত করা হয়েছিল, তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে—কেউ বা পাশ ফিরে শুয়ে আছে, কেউ বা একেবারে বসে।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে যখন এই ভয়াবহ দৃশ্যের পানে চেয়ে আছি, তখন সেই অদৃশ্য মূর্তির স্বর পুনরায় শুনতে পেলাম। আমাকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'এ দৃশ্য দেখে তোমার অন্তর কি শিউরে ওঠে না?' কিন্তু উত্তর দেবার আগেই বুঝতে পারলাম অদৃশ্য মূর্তি আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। মুহূর্ত মধ্যে কবরের আলো গেল নিবে এবং সমস্ত কবর সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। সঙ্গে-সঙ্গে হতাশ কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে চারিদিক ভরে উঠল, 'এ যাতনার কি অবসান নেই? মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, ভগবান।'

এই রকমের ভয়াবহ স্বপ্ন দেখতাম প্রায়ই—রাত্রের স্বপ্ন মনকে এমনভাবে অভিভূত করত যে দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থাতেও তার যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারতাম না। আমার স্নায়ুগুলী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল এবং দিবারাত্র আতঙ্ক মনের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে লাগল। ঘোড়ায় চড়তে আমি ইতস্তত করতাম, বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যেতে আমার ভরসা হত না। যারা আমার ব্যাধির সঙ্গে পরিচিত, তাদের কাছ ছেড়ে দূরে কোথাও যাওয়া নিরাপদ মনে হত না। কি জানি অপরিচিতদের মাঝে হঠাৎ যদি ঐ ব্যাধি আমায় আক্রমণ করে বসে, তাহলে হয়তো অকালেই আমাকে আশ্রয় নিতে হবে সমাধির মধ্যে! প্রিয়তম বন্ধুদের প্রীতিও আমি সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলাম। ভয় হত, যদি আমার মূর্চ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে হয়তো তারা আমাকে মৃত মনে করে কবর দেবার ব্যবস্থা করবে। এমন কি মাঝে মাঝে এ ভয়ও মনে জাগত যে, দীর্ঘকাল মূর্চ্ছিত হয়ে থাকলে তারা হয়তো আমাকে বিদায় করবার এ সুযোগ কোনমতেই ছাড়বে না, কেননা আমার জন্যে তাদের রীতিমত কষ্ট পেতে হত। বন্ধুরা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে কত আশ্বাস দিত, কিন্তু মন আমার নির্ভয় হতে পারত না। শেষে তাদের আমি শপথ করালাম, যতক্ষণ না দেহ পচতে শুরু করবে, ততক্ষণ তারা আমার সমাধির কোন আয়োজন করবে না। কিন্তু এতেও আমার ভয় দূর হল না—বন্ধুরা যে শপথ ভঙ্গ করবে না, তার নিশ্চয়তা কী? আত্মরক্ষার জন্যে আমি এক

অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলাম। পারিবারিক শবাগারের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করলাম যে ভেতর থেকে অতি সহজেই বার হওয়া যাবে। শবাধারের নিকটবর্তী দেওয়ালে সংলগ্ন একটি যন্ত্রেব উপব মৃদু চাপ দিলেই লৌহদ্বার তৎক্ষণাৎ খুলে যাবে। আলো হাওয়া যাতে সহজে প্রবেশ করতে পাবে তাব বন্দোবস্ত হল এবং শবাধাবেব অতি নিকটে খাদ্য ও পানীয় বাখবাব নির্দেশ দিলাম। শবাধারেব ভিতবে নবম প্যাড লাগানো হল এবং প্যাডের স্প্রীংগুলি এমন কৌশলে বসানো হল যে, দেহ সামান্য একটু নড়লেই উপবের ডালা তৎক্ষণাৎ খুলে যাবে। এ ছাড়া সমাধিগৃহেব ছাদ থেকে বড় একটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হল এবং ব্যবস্থা হল সেই ঘণ্টাব দড়ি শবাধাবেব একটি ছিদ্র দিয়ে মৃতেব একটি হাতেব সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হবে। কিন্তু হায়, নিয়তিকে প্রতিবোধ কবাব চেষ্টায় মানুষেব সতর্কতাব মূল্য কী? এই সব সুচিন্তিত কৌশলও জীবন্ত সমাধিব দুঃসহ যাতনাব হাত থেকে আমাকে বক্ষা করতে পারল না।

হঠাৎ একদিন অনুভব কবলাম—যেমন পূর্বে বহুবাব কবেছি—যেন দীর্ঘকাল অচেতন থাকাব পব ক্রমশ চেতনা লাভ কবছি। ধীরে, অতি ধীবে মনেব আকাশে চেতনাব উষা ফুটে উঠছে। সাবা দেহে কেমন এক অনির্দেশ্য বেদনাব আবেশ—সে বেদনায় তীব্রতা নেই, আছে তন্দ্রাব বিহ্বলতা। অনেকক্ষণ কানেব মধ্যে ঝিন্ ঝিন্ কবতে লাগল—তাবপব আবও কিছুক্ষণ কেটে যাবাব পব হাত-পা চিন্ চিন্ করে উঠল—তাবপর যেন অনন্তকালব্যাপী এক অপূব সুখাবেশ. স্তিমিত মস্তিষ্কেব মধ্যে চিন্তাব জাগবণ—পুনবায় ক্ষণকালেব জন্য সংজ্ঞাব বিলোপ—তাবপব হঠাৎ পূর্ণ চেতনাব আবির্ভাব। চোখেব পাতা ঈষৎ নড়ে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বুকখানা কেঁপে উঠল এক অনির্দেশ্য আতঙ্কে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কবে ভাবতে চেষ্টা করলাম। লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলবাব সে কী ব্যাকুল সাধনা! খানিকক্ষণ চেষ্টাব পবে নিজেব অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হয়ে উঠলাম। বেশ বুঝতে পবলাম, সাধারণ ঘুম থেকে এ জেগে ওঠা নয়। মনে পড়ল নিজেব দুবাবোগ্য ব্যাধিব কথা। সঙ্গে-সঙ্গে

প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত নিদারুণ ভয় অন্তরকে অভিভূত করে ফেলল।

কয়েক মিনিট স্থিরভাবে শুয়ে রইলাম। নড়বার সাহস হল না। কি জানি সন্দেহ যদি সত্যে রূপান্তরিত হয়! কিন্তু মন যেন বারংবার বলছিল, যা আশঙ্কা করছি, ঘটেছে ঠিক তাই। হতাশা—গভীর হতাশাই শেষে চোখ মেলে তাকাবার সাহস দিল। ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। অন্ধকার—চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমার মূর্চ্ছা যে কেটে গেছে এ আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। দৃষ্টিশক্তি যে পূর্ণভাবে ফিরে পেয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। অথচ চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখি না--মহানিশার অন্ধকারের মত এ অন্ধকার যেন অসীম ও সর্বব্যাপী।

চীৎকার করবার চেষ্টা করলাম -আমার ঠোঁট ও জিভ একসঙ্গে নড়ে উঠল। কিন্তু গলার ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ বেরোল না। বুকের ওপর কে যেন পাষাণভার চাপিয়ে রেখেছে--নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়

চীৎকার করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম আমার চোয়াল দুটো কাপড় দিয়ে বাঁধা—মৃত ব্যক্তির মত। এও আমি বুঝতে পারলাম যে, এক কঠিন পদার্থের উপর আমি শায়িত এবং আমার দু'পাশেই কঠিন পদার্থের চাপ। এতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়তে আমি সাহস করিনি, কিন্তু এখন আর স্থির হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। জোরে হাত দু'খানা উপরদিকে ছুঁড়লাম— সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত কাঠে লেগে হাত ফিরে এল। আমার মাথা থেকে আন্দাজ দু' ইঞ্চি উপরে কাঠের আবরণ। আমি যে শবাধারের মধ্যে শায়িত এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না।...

কিন্তু দুঃখের এই অমানিশার মধ্যে আশার ক্ষীণ আলো দেখা দিল আত্মরক্ষার জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছিলাম তা সহজেই মনে পড়ে গেল। ডালাটা খোলবার জন্য এপাশ-ওপাশ করলাম, কিন্তু ডালা খুললো না। ঘণ্টার দড়ি কব্জিতে বাঁধা থাকবার কথা—পরীক্ষা করে

দেখি, দাড় নেই। আশার ক্ষীণ আলো নিবে গেল, গভীরতর নৈরাশ্য অন্তর ছেয়ে ফেলল। পিঠের নীচে যে প্যাড নেই তা এখন বেশ বুঝতে পারলাম—কাঠের কঠিন স্পর্শে দারুণ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। তার উপব ভিজে মাটির তীব্র গন্ধ হঠাৎ নাকে এসে লাগল। বুঝতে দেরী হল না যে, আমি পারিবারিক শবাগারের মধ্যে নেই—বাড়ি থেকে দূবে, অপরিচিতদের মধ্যে নিশ্চয় আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম—কবে ও কোথায় যদিও ঠিক স্মরণ কবতে পারলাম না—এবং তারাই আমাকে নির্মমভাবে মাটিব নীচে কবব দিয়েছে সাধাবণ কফিনে আবদ্ধ করে।

যখন বুঝলাম ভূগর্ভে আমি বন্দী, তখন আব একবাব প্রাণপণে চেষ্টা কবলাম চীৎকার কবতে। এবার চেষ্টা ব্যর্থ হল না। ভয়ব্যাকুল আর্তনাদ অন্ধকারময় প্রেতপুবীব মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল।

'কে হে তুমি? এমন অদ্ভুত চীৎকাব তো কখনও শুনিনি।' কে একজন কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল।

'কী হয়েছে তোমাব?' প্রশ্ন কবল আব একজন।

'অমন কবে চেঁচাচ্ছ কেন? বেবিয়ে এসো ওখান থেকে।' তৃতীয় ব্যক্তি বিরক্তির স্ববে বলল।

তৃতীয় ব্যক্তিব কথা শেষ না হতেই যমদূতেব মত তিন চাবজন লোক আমাকে ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকানি দিতে লাগল। তাবা আমায ঠিক ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়নি—কারণ যখন চীৎকাব কবি তখন আমি জেগেই ছিলাম—তাদেব ঝাঁকানিতে শুধু লুপ্ত স্মৃতি পূর্ণভাবে ফিবে পেলাম।

এই অদ্ভুত ব্যাপাবটা ঘটেছিল ভার্জিনিয়া প্রদেশে বিচমণ্ড শহবেব কাছে। একজন বন্ধুর সঙ্গে শিকার করতে বেবিয়েছিলাম। জেমস্ নদীব তীব দিয়ে মাইল কতক যাবাব পব বাত্রি হয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেয় ভীষণ ঝড়। মাটি-বোঝাই একটা ছোট জাহাজেব কেবিন ছাড়া নিকটে আর কোন আশ্রয ছিল না। রাত্রির মত ওখানেই আমবা আশ্রয় নিলাম। জাহাজে মাত্র দুটি বার্থ—তারই একটি আমি অধিকার করলাম। এই সব মালবাহী ছোট জাহাজেব

বার্থের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমার অধিকৃত বার্থে শয্যাপত্র কিছুই ছিল না। প্রস্থে সেটি আঠারো ইঞ্চি, দৈর্ঘ্যেও তাই। ভিতরে প্রবেশ করতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু এসব অসুবিধা সত্ত্বেও আমার নিদ্রা বেশ গাঢ় হয়েছিল। আমার ঐ স্বপ্ন— না, স্বপ্ন বলা ঠিক নয়— আমার ঐ উদ্ভট কল্পনার মূলে ছিল আমার অবস্থানের বৈচিত্র্য, আমার চিন্তার সহজ ও সাধারণ গতি এবং বিশেষ করে ঘুম ভাঙার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্মৃতির অবসাদ। যারা আমাকে ঝাঁকানি দিয়েছিল তারা ঐ জাহাজের খালাসী। মাটিব গন্ধ এসেছিল জাহাজে রক্ষিত বাগানের নরম মাটি থেকে। চোয়ালের বাঁধনটা একটা সিল্কের রুমাল —যা আমি মাথায় জড়িয়েছিলাম নাইট ক্যাপের অভাবে।

যে যাতনা ভোগ করেছিলাম তা সমাধির যাতনাব চাইতে কোন অংশে কম নয়। সে যাতনা অতি ভয়াবহ --কল্পনার অতীত। কিন্তু এই অশুভ ঘটনা আমাব মঙ্গল সাধন করল। কারণ যাতনার ঐ আধিক্যেব ফলে মনের এক অদ্ভুত পরিবর্তন হল—ভয়-ভাবনা একেবারে চলে গেল, শক্তি ও সাহস ফিরে পেলাম। আমি বিদেশ যাত্রা করলাম। নিয়মিত ব্যায়াম শুরু করলাম—উন্মুক্ত স্থানে বায়ু সেবন করতে লাগলাম। মৃত্যুর চিন্তা ত্যাগ করে অন্য বিষয়ে মনো-নিবেশ করলাম। ডাক্তারী বই পড়া ছেড়ে দিলাম। রোমাঞ্চকব গল্পের বইগুলো পুড়িয়ে ফেললাম। এক কথায়, আমি একেবারে নতুন জীবন আরম্ভ করলাম। সেই ভয়ানক রাত্রির পর জীবন্ত সমাধির আতঙ্ক মন থেকে একেবারে দূর করে দিলাম এবং সেইসঙ্গে আমার ব্যাধিও চিরতরে অন্তর্হিত হ'ল

নারীর মন

গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৬০—১৮৯৩) ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম। ফরাসী সাহিত্যগুরু গুস্তভ্ ফ্লোবেয়ারের অনুপ্রেরণায় ইনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফরাসী সাহিত্যে ছোটগল্প দুই শ্রেণীর—conte ও nouvelle। প্রথমটিতে প্রায় দেড় হাজার শব্দ থাকে, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বড়। Conte রচনায় মোপাসাঁ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইনি কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করেন। এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে A Woman's Life, Pierre et Jean, Une Vie ও A Ladies' Man বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এখন সে প্যারির একজন নামজাদা অভিনেত্রী, কিন্তু যে-সময়কার কথা আমরা বলছি তখন সে সাধারণ মেয়েদেরই একজন। তার প্রেমে পড়েছিল এক তরুণ কবি। কবির প্রেম তরুণীর অন্তরকে ভরে দিয়েছিল অপরূপ মাধুর্যে। তারা থাকত ডান্যুব নদীর তীরে এক ক্ষুদ্র শহরে। দারিদ্র্যের দুঃখ তাদের অন্তরকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারত না। কবি কাব্য রচনা করত আত্মভোলা হয়ে। কবির সাফল্যে তার তরুণী প্রিয়ার আনন্দ ধরত না—প্রণয়ীর গলায় সে জয়মাল্য পরিয়ে দিত আনন্দের আবেগে। এমনি করে দিন তাদের কেটে যাচ্ছিল। জীবনে কখনো ছাড়াছাড়ি হতে পারে এ ধারণা ছিল তখন তাদের স্বপ্নের অতীত। এমন সময় যুদ্ধ বাঁধল হাঙ্গেরীতে। বিপুল আয়োজন করে অস্ট্রিয়ানরা এল হাঙ্গেরী অধিকার করতে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কবি ম্যাগিয়ার সৈন্যদলে ভর্তি হল। ক'মাস ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল। অবশেষে রুশ ও অস্ট্রিয়ার মিলিত সৈন্যের কাছে ম্যাগিয়ার সৈন্য পরাজয় স্বীকার করল।...

শত্রুসৈন্য শহর অধিকার করেছে। তরুণী খবর পেল, যুদ্ধে তার প্রণয়ীর মৃত্যু হয়েছে। তরুণী কাঁদল, কেঁদে কেঁদে চোখ তার লাল হয়ে উঠল, তারপর—চিরদিন যা হয়—বিবাহ করল আরেকজনকে।

* * *

ফ্রাউ ফন্ কুবিনী—এখন সে এই নামেই পরিচিত—বিবাহের কিছুদিন পরেই স্থির করে ফেলল, স্বামীর সঙ্গে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। লোকটি কেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। তার পূর্ব প্রণয়ী প্রায়ই বলত, অভিনেত্রী হলে সে সহজেই সুনাম অর্জন করতে পারবে—এখন সেই কথাটাই তার মনের মধ্যে কেবলই জাগতে লাগল। রঙ্গমঞ্চে যাওয়াই শেষে সে স্থির করল। স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হয়ে দিনকতক সে রইল শুধু পড়াশুনা নিয়ে। শহরের এক রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের সঙ্গে তার একটু আধটু পরিচয় ছিল—কাজ যোগাড় হয়ে গেল সহজেই। প্রথম দু'চারটে ছোটখাটো ভূমিকায় একটু খ্যাতি অর্জন করার পর সে নামতে লাগল নায়িকার ভূমিকায়। মাস কয়েকের মধ্যেই তার নাম লোকের মুখে মুখে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কত লোকই না উৎসুক! শহরের ধনীরা অভিনয়ের পর রোজই তার সাজঘরের সামনে ভীড় করে ফুলের তোড়া হাতে ক'রে। অভিনেত্রী কারো পানে চেয়ে দেখে না।······

হঠাৎ একদিন অভিনেত্রীর একটু পরিবর্তন দেখা গেল। সৈন্য-বিভাগের কর্তা—শহরের শাসনভার এখন যাঁর হাতে—তিনি এসে-ছিলেন কুবিনীর অভিনয় দেখতে। লোকটি আধাবয়সী—চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে আর ব্যবহারও অত্যন্ত মোলায়েম। অভিনয়ের পর তিনি কুবিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। রঙ্গমঞ্চের কর্তাও ছিলেন সঙ্গে। কুবিনী তাঁর ফুলের তোড়াটি আগ্রহের সঙ্গেই নিল। নেবার সময় তার ঠোঁটের কোণে গর্বের একটু হাসি ফুটে উঠল। অত বড় লোকটা যে-ভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল তাতে মনে একটু গর্ব না হওয়াটাই আশ্চর্য!···দু'চারদিন পরেই লোকে শুনল, কুবিনী রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে—সে আছে সৈনাধ্যক্ষের গৃহে তাঁর প্রণয়িনী

হয়ে। সৈনাধ্যক্ষ তাঁর প্রণয়িনীকে সুখী করতে কিছুরই অভাব রাখেননি। বিলাসের সমারোহের মধ্যে কুবিনীর দিন কাটতে লাগল।...

তারপর একদিন এক কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটে গেল। যাকে সবাই মৃত বলেই জানত সে ফিরে এল বেঁচে। সেদিন কুবিনী সৈনাধ্যক্ষের গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছিল। নরম গদীতে হেলান দিয়ে বসে অন্যমনস্কভাবে দু'পাশের জনতাকে লক্ষ্য করছিল সে, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে গেল পথচারী এক সাধারণ অস্ট্রিয়ান সৈনিকেব উপর। কুবিনী নিজেব অজ্ঞাতেই চেঁচিয়ে উঠল অবাক্ত বিস্ময়ে! তাব সে চীৎকার কারো কানে পৌঁছল না--কেউই লক্ষ্য করল না এই স্থিরচিত্ত উচ্ছ্বাসবর্জিত নারীব আকস্মিক চাঞ্চল্য! পথের যে সৈনিকটি তাকে হঠাৎ এমনি কবে বদলে দিল তাবও পানে দৃষ্টি দিল না কেউ!

পরের দিনই কবির ডাক পড়ল। কবি তো ভেবেই পেল না, কী এমন কাবণ থাকতে পারে যার জন্যে তাকে প্রয়োজন হতে পাবে সৈন্যাধ্যক্ষেব। বেশ একটু কৌতূহল নিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষেব আবাসে সে উপস্থিত হল।

কাব জানত না সৈন্যাধ্যক্ষেব প্রণয়িনী কে। সে শুধু শুনেছিল তাদেরই দেশের একটি মেয়ে সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মবিক্রয় কবেছে— শুনে অবধি তাব প্রতি তার মন বিতৃষ্ণায় ভবে ছিল। তাব কেবলই মনে হচ্ছিল, তার সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো।

সে যে আসবে একথা যেন আগে থেকেই দ্বাবরক্ষীর জানা ছিল। তাকে সে এক ভৃত্যের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল ভিতবে। বারান্দার এক কোণে টেবিলের উপব চাকরদেব ব্যবহাবের এক প্রস্থ পোশাক পড়েছিল। ভৃত্য সেইদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল, তাবই জন্যে ঐগুলো আনা, কর্ত্রীর খাসকামরার চাকর সে। কবির চোখদুটো ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। অদৃষ্টের পরিহাস মনে করে নিজেকে সে সংযত করে নিল। সে ভাবতে লাগল, কোনদিন কি এই নারীর প্রতি সে কোনো অবিচার করেছে—যার জন্যে তাকে

এই ভাবে অপমানিত করার আয়োজন! কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার আগেই সংবাদ এল, কর্ত্রী তাকে আহ্বান করেছেন।

সংবাদ-বাহক তাকে এক সুসজ্জিত কক্ষে পৌঁছে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। কবি দাঁড়িয়ে রইল কর্ত্রীর প্রতীক্ষায়। খানিক পরেই পর্দাটা সরে গেল—কর্ত্রী কবির সামনে এসে উপস্থিত। তাকে বেশ স্থির বলেই মনে হল, কিন্তু মুখখানা অত্যন্ত বিবর্ণ। মূল্যবান পরিচ্ছদে তার দেহ আবৃত। কবি তাকে দেখেই চিনতে পারল। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকল, "ইর্মা!"

সে ডাক পিয়াসী তরুণীর বুকে বাজল তীরের মত। স্থির থাকতে পারল না সে, প্রণয়ীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু এ শুধু ক্ষণেকের জন্য। কবি তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে নিল।

তরুণী বলল, "এর জন্য আমায় তুমি দোষ দিতে পারো না। সবাই জানত, দেশের জন্যে তুমি প্রাণ দিয়েছ। আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি"

কবি শ্লেষের সুরে বলল, "সত্যই তোমার অসীম দয়া। কিন্তু আমার কাছে তুমি কৈফিয়ৎ দিচ্ছ কেন? আমি তোমার দাস। তুমি আদেশ করবে-আমি তা' পালন করব বিনা দ্বিধায়। এই না আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ!"

তরুণীর চোখদুটো জলে ভরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল অশ্রু গোপন করতে।

কবি লক্ষ্য করে বলল, "তোমাকে আঘাত করার জন্যে আমি ও কথা বলি নি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের আর দেখা না হলেই ছিল ভালো। কেন তুমি আমায় এভাবে এখানে আটকে রাখতে চাও? তুমি যে-পথে চলেছ আমি তা'তে বাধা জন্মাতে চাই নে—আমায় আমার পথে চলতে দাও। আমার সুখ তুমি কেড়ে নিয়েছ—এখন চাও আমায় লাঞ্ছিত করতে?"

তরুণী কান্নার সুরে বলল, "তুমি আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবলে

কি করে? তোমার দুর্ভাগ্যের কথা শোনাব পর থেকে তোমায় সুখী করতে কত চেষ্টাই না আমি করেছি।"

তার কথা শেষ না হতেই কবি ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, "তাই বুঝি তোমার বর্তমান প্রণয়ীকে অনুরোধ করেছ আমায়—তোমার পূর্ব প্রণয়ীকে তোমারই অধীনে একটি চাকরি দিতে।"

"তুমি আমায় এমন কথা বলছ···আমি যে ··" তরুণীর কণ্ঠস্বর কান্নায় ধরে এল।

কবি তিক্তকণ্ঠে বলল, "তুমি বোধ করি আমায় শাস্তি দিতে চাও তোমায় একান্তভাবে ভালবাসার জন্যে। এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না -নারীর স্বভাবই যে ঐ। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার এ লাঞ্ছনা তোমার এক নতুন অভিজ্ঞতার--এক নতুন আনন্দের কারণ হবে।"

তার কথা শেষ হবার আগেই তরুণী সেখান থেকে সরে গেল। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার চাপা আওয়াজ কবি শুনতে পেল, কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপও করল না। তরুণীর প্রতি তার ঘৃণা বেড়ে গেল যখন সে লক্ষ্য করল চারিদিকের ঐশ্বর্য ও বিলাস।

কিন্তু কেন এ ক্রোধ কেন এ জ্বালা! সে তো তার দাসত্ব গ্রহণ করেছে, আর দাস যে তার তো স্বাধীন মত থাকতে পারে না- শুধু আদেশ পালন করাই যে তার কাজ।

সৈন্যাধ্যক্ষের দুটি বন্ধু একটু পরেই চায়ের নিমন্ত্রণে আসবেন। কবিকে সে সময় হাজির থাকতে হবে তাঁদের কাছে।

কবি ব্যস্ত ছিল পাকশালার কাজে পাচককে সাহায্য করতে। পাশের ঘরের হাসি তামাসা বেশ স্পষ্টভাবেই শোনা যাচ্ছিল। খানিক পরে পাচক দরজাটা খুলতেই কবির সারা দেহ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ফ্রাউ ফন কুবিনী—তার ডান হাতখানা সৈন্যাধ্যক্ষের মুঠোর ভিতরে।···

কুবিনীর দৃষ্টি কবির মুখের উপর ন্যস্ত—সে-দৃষ্টিতে জয় বা ঘৃণার চিহ্নমাত্র নেই—আছে গভীর মমতা ও সহানুভূতি!

সে কি তবে কোনোদিন অজ্ঞাতে তার কোন অনিষ্ট করেছে!—কবি কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল।…

ঘৃণা, প্রেম, বিদ্বেষ, ঈর্ষা তার মনের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল।…পাত্রে সুরা ঢালতে গিয়ে তার হাতটা কাঁপতে লাগল।

সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করছিলেন।…"তুমি যার কথা বলছিলে সেই নাকি?"

প্রণয়িনী ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

সৈন্যাধ্যক্ষ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সামান্য ভৃত্য হবার জন্যে এর জন্ম হয়েছে বলে মনে হয় না।"

মৃদুস্বরে কুবিনী উত্তর করল, "সৈনিক হবার জন্যেও না।"

কথাগুলো কবির অন্তরকে জোরে ধাক্কা দিল।…কিন্তু এটা সে বেশ বুঝতে পারল, কুবিনী তারই পক্ষ সমর্থন করছে। সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে—পাছে কবির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে তার জন্যে তাকে রীতিমত সন্ত্রস্ত বলে মনে হল।

কিন্তু কবির মন তখনো সন্দেহের আঁধার পথে ফিরতে লাগল।…নারী চায় বৈচিত্র্য—উত্তেজনা! একদিন যাকে ভালবেসেছিল স্বেচ্ছায় হৃদয় দিয়েছিল, আজ তাকে দয়ার ভিখারীরূপে পাওয়ায় বৈচিত্র্য উত্তেজনা—দুইই আছে! নতুন প্রণয়ীর সামনে তাকে লাঞ্ছিত করে যদি তার আনন্দ লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকত তাহলে তাও হয়তো করতে কুণ্ঠিত হত না সে!…

কবি হঠাৎ চোখ তুলল। চোখ তার কুবিনীর চোখের সাথে এক হয়ে গেল। কুবিনীর দৃষ্টি বেদনায় ভরা…কবি চোখ নামিয়ে নিল…তার চিন্তাগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেল।

সেদিন থেকে কবি সৈন্যাধ্যক্ষের বাড়িতে আছে। এখন আর তাকে কত্রার কোন কাজই করতে হয় না। কর্ত্রীর সঙ্গে দেখাও তার হয় না কোনোদিন—সেও খবর নেবার চেষ্টা করে না।

এইভাবে কেটে গেল তু'মাস। হঠাৎ একদিন সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠালেন।

দর্শনার্থীরা যে-ঘরে বসে ছিল.কবি সেখানে উপস্থিত হল। খানিক পরেই বাইবের কি একটা কাজ সেরে সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরলেন। তাঁকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল। কবিব দিকে দৃষ্টি পড়তেই সৈন্যাধাক্ষ তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। ' বললেন, "তুমি এখন যেখানে খুশি যেতে পাবো—মুক্তিক্রয়েব অনুমতি পবিষদ্ তোমায় দিয়েছে।"

বিস্মিত কবি বলল, "সে কি! · কিন্তু আমি· ·"

"মুক্তিমূল্যও পবিষদ্ পেয়েছে—তুমি এখন মুক্ত।"

"এ যে আমি ভাবতে পাবছি না! আপনি আমাব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ··"

"কৃতজ্ঞতা আমায় জানাবাব কোনো দবকাব নেই। তোমায় মুক্ত করেছেন ফ্রাউ ফন্ কুবিনী।"

কবিব হৃদয়েব স্পন্দন যেন থেমে গেল! চেষ্টা কবেও সে একটি কথা মুখ দিয়ে বা'ব কবতে পাবল না। নত হয়ে সৈন্যাধ্যক্ষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে প্রস্থান কবল

কুবিনীব কক্ষেব দিকে সে দ্রুতপদে চলল। তাব প্রতি সে যে অবিচাব কবেছে—মিথ্যা ধাবণাব বশবর্তী হয়ে তাকে যে নিষ্ঠুবভাবে আঘাত কবেছে তাব জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা কবতে! তীব্র অনুশোচনায় তখন তার অন্তব দগ্ধ হচ্ছে। কুবিনীব কক্ষদ্বাবে উপস্থিত হতেই একটি পবিচাবিকা জানিয়ে দিল, কত্রীব সঙ্গে দেখা হবে না তার।

"কেন?" রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল কবি।

"এখানে নেই তিনি—চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?···কোথায়?" কবির কণ্ঠস্বব আর্তনাদেব মত শোনাল। "প্যারিতে···ঘণ্টা দুই আগে।"

কবি নিশ্চল—অব্যক্ত বেদনায় মুখ তার পাণ্ডুর!

"অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে?" ব্যস্তভাবে বলল পরিচারিকা, "শরীরটা ভাল নেই বুঝি?. এসো, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও—কোনো জরুরী কাজ নেই তো?"

নকল হীরা

মঁসিয়ে লাস্ত্যাঁ মেয়েটিকে দেখেন তাঁর এক বন্ধুর গৃহে এক সান্ধ্য আসরে। অমন সুন্দরী মেয়ে প্যারির মত শহরেও বড় বেশী চোখে পড়ে না। প্রথম আলাপেই লাস্ত্যাঁ তার প্রেমে পড়ে গেলেন।

মেয়েটির বাপ ছিলেন সরকারী কর্মচারী। প্যারির কাছেই এক ছোট শহরে তিনি থাকতেন। মাস কয়েক হল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটির মা প্যারিতে এসেছেন মেয়েটিকে নিয়ে। মনে তাঁর আশা, প্যারিতে কিছুদিন থাকলে মেয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন—সুপাত্রের অভাব প্যারিতে হবে না নিশ্চয়ই। এরই মধ্যে দু'চারঘর প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে তাঁর।

মেয়েটির যে শুধু রূপ আছে তা নয়—গুণও তার অনেক। অতি নম্র ধীর সে, গর্বের লেশমাত্র নেই—সকলকে আনন্দ পরিবেশন করাই যেন তার জীবনের লক্ষ্য। অধরে সব সময় প্রসন্নতার মিষ্ট হাসি—সংসারের কোন দুঃখ জ্বালা যেন তা নিমেষের তরেও মলিন করতে পারে না! এক কথায়, যে-রকম মেয়েকে পুরুষমাত্রেই কামনা করে জীবন-পথের সাথী ক'রে নিতে, এ-মেয়েটি ঠিক তাই। প্রতিবেশীদের মুখে তার প্রশংসা ধরে না। সকলেই বলে, এ-মেয়ে যাকে স্বামিত্বে বরণ করবে পরম ভাগ্য তার!

মঁসিয়ে লাস্ত্যাঁর সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে। এখন তাঁর বেতন তিন হাজার পাঁচ শো ফ্রাঁ। এ টাকায় বিবাহ ক'রে সংসারী হওয়া চলে। কিছুদিন যাতায়াতের পর লাস্ত্যাঁ একদিন মেয়েটির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন—মেয়েটি সানন্দে সম্মতি জানাল।

বিবাহের পর লাস্ত্যাঁর দিনগুলি পরম আনন্দে কাটতে লাগল। স্ত্রী গৃহকর্মে সুপটু—এমন হিসাবী সে যে সংসারে কোন অভাবই নেই—বরং মনে হয় যেন বিলাসের মধ্যেই দিন কাটছে! তাঁকে সবরকমে সুখী করতে স্ত্রীর কতই না আগ্রহ! তাঁর সামান্য এতটুকু কষ্ট তাকে ব্যস্ত চঞ্চল করে তোলে।

স্ত্রী সোহাগ ও যত্নে তাঁকে এমনই মুগ্ধ করে রেখেছে যে বিবাহের ছ'বছর পরেও লাস্ত্যাঁ মনে মনে ভাবেন, 'মধুচন্দ্রে'র প্রথম ক'টা দিন স্ত্রীকে যতখানি ভালবেসেছিলেন, এখন যেন ভালবাসেন তার চেয়ে অনেক বেশী!

স্ত্রীর দোষের মধ্যে দু'টি—সে দোষ তেমন মারাত্মক না হলেও লাস্ত্যাঁর চোখে তা ভাল ঠেকে না। একটি, রঙ্গালয়ের প্রতি তার অনুরাগ; অপরটি, কৃত্রিম মণিমুক্তার অলঙ্কার ব্যবহারের সাধ। সপ্তাহে দু'তিন দিন, বিশেষ করে কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হলেই, তার সঙ্গিনীরা—এদের মধ্যে বেশীর ভাগই অল্প বেতনের কর্মচারীর স্ত্রী—আগে থেকেই তার জন্যে আসন সংগ্রহ করে রাখে, আর সারাদিন আপিসের খাটুনির পর—ইচ্ছা থাক আর নাই থাক—লাস্ত্যাকে থিয়েটারে যেতে হয় স্ত্রীর সঙ্গী হয়ে।

কিছুদিন পরে লাস্ত্যাঁ একদিন স্ত্রীকে বললেন, এবার থেকে সে যেন তার পরিচিতা কোনো মেয়ের সঙ্গে থিয়েটারে যাবার ব্যবস্থা করে—সারাদিন আপিসে খেটে তিনি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে বাড়ি ফিরে থিয়েটার দেখতে যাবার ইচ্ছা তাঁর একেবারেই থাকে না। স্ত্রী একথায় প্রথমে ঘোর আপত্তি তুলল, শেষে স্বামীর বিশেষ পীড়াপীড়িতে রাজী হল। লাস্ত্যাঁ যেন এক মহা দায় থেকে বেঁচে গেলেন।

থিয়েটারের প্রতি অনুরাগ যেমন তার ক্রমেই প্রবল হয়, অলঙ্কারের প্রতি লালসাও তেমনি দিনে দিনে বাড়ে। পোশাকে অবশ্য কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু নানারকমের অলঙ্কার তার দেহের শোভা বর্ধন করতে লাগল। কানে তার সাদা পাথরের দুল—দেখতে হীরার মত ঝক্‌ঝকে, কণ্ঠে কৃত্রিম মুক্তার মালা, মণিবন্ধে ব্রেসলেট।

স্বামী অনুযোগ করে বলেন, আসল মণিমুক্তা কেনবার যখন তোমার সঙ্গতি নেই, কী হবে ওসব ঝুটো পাথরের গহনা পরে? মেয়েদের যা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—সৌন্দর্য ও শিষ্টতা—তার কিছু তোমার অভাব আছে? ওই নিয়েই তোমার সাধারণের সামনে বের হওয়া উচিত।

স্ত্রী হেসে বলে, বুঝি এ আমার দুর্বলতা। কিন্তু কি করবো, এ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না।

তারপর সে মুক্তার মালাটি আঙুলে জড়িয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে, আলোয় মুক্তাগুলি ঝিকমিক করে ওঠে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে বলে, দেখছ, কী উজ্জ্বল এদের দীপ্তি! কে না বলবে, এ মুক্তা আসল।

স্বামী ঈষৎ হেসে বলেন, তোমার রুচি সত্যিই অদ্ভুত! এতে যে তোমার কী তৃপ্তি তা তুমিই জানো।

সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে স্বামী স্ত্রী যখন চা পান করেন, তখন প্রায়ই স্ত্রী উঠে গিয়ে তার গহনার বাক্সটি নিয়ে আসে। মরক্কো চামড়ার সুদৃশ্য বাক্স,- চায়ের টেবিলের উপর সযত্নে সেটি রেখে কৃত্রিম মণি-মুক্তাগুলি পরম আগ্রহের সহিত সে নিরীক্ষণ করে। চেয়ে চেয়ে আশা তার মেটে না— যেন কি গোপন আনন্দ তার মধ্যে নিহিত। তারপর একছড়া হার তুলে নিয়ে সোহাগভরে স্বামীর গলায় সে পরিয়ে দেয়। স্বামী আপত্তি করেন, কোনো আপত্তিই সে শোনে না, কৌতুকহাস্যে মুখ উজ্জ্বল ক'রে বলে,—বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। তারপর স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গভীর অনুরাগে তার মুখ চুম্বন করে।

একদিন এক শীতের রাত্রে অপেরা থেকে বাড়ি ফিরে সে জ্বরে পড়ল। জ্বরের সঙ্গে কাসি—ক্রমশ নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। স্বামী সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলেন না। আটদিনের দিন স্বামীর কাছ থেকে চিরদিনের জন্য সে বিদায় নিল।

মঁসিয়ে লান্তঁ্যা শোকে এমন কাতর হয়ে পড়লেন যে একমাসের

মধ্যেই চুল তাঁর সাদা হয়ে গেল। অশ্রুপাতের বিরাম নেই,—মৃতা স্ত্রীর কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে, আর তাঁর দু'চোখ জলে ভরে আসে!

দিন যায়; লান্তঁ্যার দুঃখ কিন্তু এতটুকু কমে না, বরং দিনে দিনে তাঁর নৈরাশ্য বাড়ে। আপিসে বসে যখন তিনি কাজ করেন তখন প্রায়ই উন্মনা হয়ে পড়েন। আশেপাশে সহকর্মীরা কত কি আলোচনা করছে, তাদের কলরব তাঁর কানে আসে না। দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টিতে শূন্যপানে তিনি চেয়ে থাকেন।···স্ত্রী বেঁচে থাকতে তার ঘর যেমনভাবে সাজানো ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। তার আসবাবপত্র, এমন কি সাজপোশাক—কিছুই স্থানচ্যুত হয়নি। প্রতিদিন মঁসিয়ে লান্তঁ্যা এ ঘরে এসে খানিকক্ষণ বসেন, আর একলা বসে বসে ভাবেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কথা—যার বিহনে জীবন তাঁর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে!···

জীবনের পথ ক্রমেই জটিল হয়ে আসে—অর্থের অনটন লান্তঁ্যাকে বিব্রত করে তোলে। স্ত্রী বেঁচে থাকতে তাঁর যা আয় ছিল, আজও ঠিক তাই; অথচ তখন সংসার চলত বেশ সচ্ছলভাবে, আজ তার একার অভাবই মেটে না। লান্তঁ্যা অবাক হয়ে ভাবেন, কেমন করে সে ওই সামান্য অর্থে সংগ্রহ করত অমন উৎকৃষ্ট সুরা ও উপাদেয় ভোজ্য,—তিনি তো কই পারেন না!

লান্তঁ্যার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠল। চারিদিকে দেনা—দিন আর চলে না। একদিন সকালে দেখেন, পকেট একেবারে শূন্য। স্থির করলেন, কিছু বিক্রি করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করবেন। কিন্তু কী বিক্রি করা যায়? অমনি মনে পড়ল স্ত্রীর অলঙ্কারের কথা। এই ঝুটো অলঙ্কারের প্রতি বরাবরই তিনি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। এ যেন তাঁর দৃষ্টিকে বেঁধে, প্রিয়তমার মধুর স্মৃতিকে পঙ্কিল করে!

মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্ত্রী এই ঝুটো অলঙ্কার খরিদ করেছে। এমন দিন খুব কম গেছে যেদিন রাত্রে সে বাড়ি ফিরেছে নতুন কোনো অলঙ্কার না নিয়ে। অলঙ্কারগুলি খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে লান্তঁ্যা ভারী এক ছড়া নেকলেস তুলে নিলেন বিক্রি করবার জন্যে। মনে মনে

ভাবলেন, এব দাম ছ'সাত ফ্রাঁর কম হবে না—মেকী হলেও এর কারুকার্যটিসতাই সুন্দব !···

নেকলেসটি পকেটে ফেলে লান্ত্যা বাড়ি থেকে বেরুলেন, তাবপর এক মণিকাবেব দোকানেব সামনে এসে একটু ইতস্তত করে ভিতরে ঢুকলেন। নিজেব দারিদ্র্য এমন কবে অপবেব কাছে প্রকাশ করতে কাব না বাধে !

নেকলেসটি এগিযে দিযে লান্ত্যা একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—এব দাম কত হতে পাবে, দয়া কবে বলবেন কি ?

মণিকাব নেকলেসটি পবীক্ষা কবে, সহকাবীকে ডেকে নিম্নস্বরে কী বলল ; তাবপব পুনবায অলঙ্কাবটি টেবিলের উপব বেখে দূব থেকে ভালো কবে নিবীক্ষণ কবতে লাগল।

এই অর্থহীন আডম্বব লক্ষ্য কবে লান্ত্যা বিরক্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন,—অনর্থক দেবী কবেন কেন ? এব দাম যে কিছু নয, এ তো আমাব জানাই আছে।- ঠিক সেই সময মণিকাব বলল— দেখুন, এ নেকলেসেব দাম বাবো হাজাব থেকে পনেবো হাজাব ফ্রাঁব মধ্যে, কিন্তু আমি আপনাব জিনিস কিনতে পাবি না যতক্ষণ না জানছি কোথায় আপনি এটি পেয়েছেন।

বিস্মযে দুই চোখ বি স্ফাবিত কবে লান্ত্যা মণিকাবেব মুখেব পানে চেয়ে বইলেন। পনেবো হাজাব ফ্রাঁ ! এ যে অসম্ভব কথা ! খানিক পবে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন,—আপনি যা বলছেন ঐ তাহলে এব দাম ?

নীবসকণ্ঠে মণিকাব উত্তব দিল,—আব কোথাও যাচাই কবে দেখতে পাবেন, এব বেশী যদি কেউ দেয় তাবই কাছে বেচবেন। পনেবো হাজাব ফ্রাঁ পর্য্যন্ত আমি দিতে পাবি—-ঐতেই বাজী থাকেন তো আসবেন।

নেকলেসটি তুলে নিয়ে লান্ত্যা দোকানেব বাইবে এলেন। মণিকারের নির্বুদ্ধিতাব কথা ভেবে ভাবী হাসি পেল তাঁব। মনে মনে বললেন, এমন বোকাও মানুষ হয় !···

আমি যদি সত্যিই ওর কথা বিশ্বাস করতাম! লোকটা পাকা জহুরী নয়, নইলে ঝুটোকে মনে করে আসল হীরা!…

মিনিট কয়েক পরে লাস্ত্যাঁ রু-দ্য-লা-পে-তে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এক নামজাদা জহুরীর দোকান। ত্বরিতপদে লাস্ত্যাঁ দোকানের ভিতর প্রবেশ করলেন। নেকলেসটি দেখেই জহুরী সাশ্চর্যে বলে উঠল—বাঃ এ যে দেখছি আমার এখান থেকে কেনা।

বিচলিতস্বরে লাস্ত্যাঁ জিজ্ঞাসা করলেন,—এর দাম কত বলুন তো?

—দাম? আমি অবশ্য এটি বেচি বিশ হাজার ফ্রাঁয়,—তবে ও দাম আমি দিতে পারবো না। আঠারো হাজারে আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তো নিতে পারি…কিন্তু এক শর্তে…এ-জিনিস আপনার হাতে এল কি করে আপনাকে তা বলতে হবে… জানেনই তো আমাদের ব্যবসার এ দস্তুর…

লাস্ত্যাঁ একেবারে হতবুদ্ধি! অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে জড়িতস্বরে বললেন,—কিন্তু ভালো করে একবার পরীক্ষা করুন দেখি…এক মুহূর্ত আগেও আমার ধারণা ছিল, এ জিনিস আসল নয়, ঝুটো।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করল,—আপনার নাম কি, মঁসিয়ে?

—লাস্ত্যাঁ…স্বরাষ্ট্রবিভাগের মন্ত্রীর অধীনে আমি কাজ করি ষোল নম্বর রু দ্য মারত্‌-এ আমার বাসা।

দোকানদার খাতা খুলে দেখতে লাগল। খানিক পরে খাতার পৃষ্ঠায় চোখ রেখে বলল, এই নেকলেস পাঠানো হয়েছিল মাদাম লাস্ত্যাঁর ঠিকানায়—ষোল নম্বর রু দ্য মারত্‌।

লাস্ত্যাঁ বিস্ময়ে নির্বাক। জহুরী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চায়,—চোরাই মাল নয় তো?

খানিক পরে জহুরী বলল,—ঘণ্টা কয়েকের জন্যে এ নেকলেস আমার দোকানে রেখে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি? আমি অবশ্য আপনাকে রসিদ দেবো।

লাস্ত্যাঁ তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—না, আপত্তি কিসের ?

তারপর জহুরীর দেওয়া রসিদখানি পকেটে পুরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

অনেকক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে পথে পথে তিনি ঘুরতে লাগলেন। মন তাঁর বিভ্রান্ত ! কিছুতেই যেন ব্যাপারটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এত দামী অলঙ্কাব কেনবাঁব মত সঙ্গতি তাঁর স্ত্রীব ছিল কি ? নিশ্চয়ই না। তবে এ হয়তো কাবো উপহার !···কিন্তু কার উপহাব ?··· কেনই বা এই উপহার দেওয়া ?

চলতে চলতে রাস্তার মাঝেই তিনি থামলেন। এক ভীষণ সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। · সে কি·· যদি তাই হয়, তবে আব সব অলঙ্কারও উপহার ? ··

পায়েব নীচেকাব মাটি যেন দুলতে লাগল—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। সংজ্ঞাশূন্য হয়ে লাস্ত্যাঁ মাটিতে পড়ে গেলেন।···চেতনা যখন ফিবে এল তখন তিনি এক ডাক্তারখানায়। শুনলেন জন কয়েক লোক এখানে তাকে রেখে গেছে। একটু সুস্থ বোধ করতেই লাস্ত্যাঁ ধীরে ধীরে বাড়ি ফিবে এলেন। বাড়ি পৌঁছেই ঘবে দবজা দিয়ে গভীব দুঃখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে-কেঁদে শরীর তাঁর অবসন্ন হয়ে এল। তারপব কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি জানেন না।

পবেব দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই আপিসে যাবার জন্যে তিনি তৈবী হতে লাগলেন। কিন্তু এবকম আঘাতের পব কাজে আব মন আসে না ! একদিনেব ছুটি প্রার্থনা ক'রে আপিসেব কর্তাকে তিনি চিঠি লিখলেন—তাবপব চাকবকে ডেকে সেই চিঠি আপিসে পৌঁছে দিতে বললেন। একটু পরেই মনে পড়ল জহুরীর সঙ্গে দেখা করবার কথা। দেখা কবতে মন চায় না—কিন্তু নেকলেসটিই বা কেমন কবে ওব কাছে ফেলে রাখা যায় !···তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে বাড়ি থেকে তিনি বেরুলেন।

সেদিনের প্রভাত অতি সুন্দর। নির্মেঘ, নীল আকাশের নীচে রৌদ্রদীপ্ত শহরটি অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করেছে। রাস্তা দিয়ে

লোক চলেছে কাজে, যাদের কোনো কাজকর্ম করতে হয় না, তারা পরম নিশ্চিন্তভাবে, পকেটে হাত পুরে ইতস্তত চলাফেরা করছে। তাদের লক্ষ্য ক'রে ম'সিয়ে লাস্ত্যঁা মনে মনে বললেন,— ধনীরাই বাস্তবিক সুখী। টাকা থাকলে দুঃখ শোক—তা সে যেমনই হোক না—সহজেই ভোলা যায়। যেখানে খুশি লোক যেতে পারে,—আনন্দ, বৈচিত্র্য, সমারোহ' কিছুরই অভাব হয় না,— দু'দিনেই মনের ঘা শুকিয়ে আসে! হায়, আমি যদি ধনী—হ্যাঁ, শুধু ধনী হতাম!

কাল সারাদিন উপবাসে কেটেছে, আজ এখনো কিছু খাননি, লাস্ত্যঁা ক্ষুধার্ত বোধ করলেন। কিন্তু পকেট একেবারে শূন্য যে! আবার মনে পড়ল নেকলেসের কথা! আঠারো হাজার ফ্রাঁ! আঠারো হাজার ফ্রাঁ! এত টাকা একসঙ্গে কখনো পেয়েছেন বলে মনে পড়ে না।...

কিছুক্ষণ পর রু-দ্য-লা-পে-তে তিনি পৌঁছলেন। সামনেই সেই জহুরীর দোকান। আঠারো হাজার ফ্রাঁ! বিশ বার তিনি সঙ্কল্প করলেন ভিতরে ঢোকবার, কিন্তু প্রতিবারই লজ্জা বাধা দিল। ক্ষুধায় তিনি কাতর.. অত্যন্ত কাতর...পকেটে এক কপর্দকও নেই!.. তাড়াতাড়ি কর্তব্য স্থির করে, তিনি ছুটে চললেন দোকানের দিকে, ভাববার অবসর যাতে এতটুকু না মিলে! একেবারে দোকানের ভিতরে এসে তিনি থামলেন।

দোকানদার উঠে এসে সসম্ভ্রমে চেয়ার এগিয়ে দিল। দোকানের কর্মচারীরা তাঁর দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

আমার যা জানবার ছিল, জেনেছি—দোকানদার বলল বিনীতভাবে —আপনি যদি ওই নেকলেস বেচবার ইচ্ছা ত্যাগ না করে থাকেন,— আমাকে বলুন, কাল যে দর বলেছি সেই দরে কিনতে আমি প্রস্তুত আছি।

লাস্ত্যঁা বাধবাধভাবে বললেন,—তা—হ্যাঁ—আমি বেচতেই তো এসেছি।

দোকানদার দেরাজ খুলে আঠারোখানি নোট বা'র করে লাস্ত্যাঁর সামনে ধরল। রসিদ লিখে দিয়ে, লাস্ত্যাঁ কম্পিতহস্তে নোটগুলি নিয়ে পকেটে পুরলেন।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে লাস্ত্যাঁ আবার ফিরলেন। দোকানদার জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের পানে তাকাল। মাথা নীচু ক'রে লাস্ত্যাঁ বললেন,—আরও খানকয়েক অলঙ্কার আমার আছে। কেনেন যদি, নিয়ে আসতে পারি।

দোকানদার সবিনয়ে বলল,—আনবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সব অলঙ্কারগুলি নিয়ে লাস্ত্যাঁ দোকানে এসে হাজির। জহুরী অলঙ্কারগুলি একে একে পরীক্ষা করে দাম ঠিক করল। হীরার দুলের দাম বিশ হাজার ফ্রাঁ, ব্রেসলেট পঁয়ত্রিশ হাজার, আংটি ষোল হাজার, এক সেট চুনী পান্না চৌদ্দ হাজার, সোনার এক ছড়া চেন্, বড় এক খণ্ড হীরা তা'তে দুলছে, চল্লিশ হাজার —সবসুদ্ধ এক শো তেতাল্লিশ হাজার ফ্রাঁ।

ঈষৎ হেসে জহুরী বলল,—আপনার স্ত্রী দেখছি যা কিছু সঞ্চয় সবই ব্যয় করেছিলেন হীরা জড়োয়ায়!

লাস্ত্যাঁ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন,—অর্থ সঞ্চয়ের এ একটা রীতি।

সেদিন ভয়সিঁতে বসে লাস্ত্যাঁ বৈকালিক জলযোগ করলেন— খাদ্যের সঙ্গে যে সুরা পান করলেন তার এক বোতলের দাম বিশ ফ্রাঁ। তারপর একখানি গাড়ি ভাড়া করে 'বোয়া'র চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন। পথে কত রকমের সুদৃশ্য গাড়ি, বিচিত্র বেশভূষায় আরোহীরা সজ্জিত, তাদের পানে চেয়ে লাস্ত্যাঁ অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, গর্বিত উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমিও তোমাদের মত ধনী, —বিলাসিতা করবার সামর্থ্য আমারও আছে! দু'লক্ষ ফ্রাঁর মালিক আমি আজ!...

হঠাৎ আপিসের কথা মনে পড়ল। কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করা চাই।...গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল। উৎফুল্লভাবে লাস্ত্যাঁ ভিতরে প্রবেশ করলেন। কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন,

কাজে তিনি ইস্তফা দিতে চান। এইমাত্র তিন লক্ষ ফ্রাঁ উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি পেয়েছেন। সহকর্মীদেরও এই শুভ সংবাদ দিতে তিনি ভুললেন না।

সন্ধ্যার পর কাফে আঙ্গলে-তে তিনি উপস্থিত হলেন। এখানে খাওয়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে তাঁর আর কখনো হয়নি। যে-লোকটির পাশে গিয়ে তিনি বসলেন, তাঁকে দেখে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে মনে হল। খেতে খেতে একসময় তাঁকে বললেন—অবশ্য কথাটা যেন বিশেষ গোপনীয় এইভাবে—যে সম্প্রতি উত্তরাধিকারীরূপে তিনি পেয়েছেন—চার লক্ষ ফ্রাঁ।

জীবনে এই প্রথম থিয়েটারে বসে থাকতে তাঁর কোনো কষ্ট হল না।…বাকী রাতটুকু তিনি কাটিয়ে দিলেন আমোদ-প্রমোদে।

ছ'মাস পরে লান্তঁ্যা বিবাহ করলেন আবার। তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মশীলা ছিল বটে, কিন্তু তার মেজাজটা উগ্র। লান্তঁ্যা তাকে বিবাহ করে সুখী হতে পারেননি।

নিন্দুক

আন্তন চেকভ (১৮৬০—১৯০৪) রুশ কথাসাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিক লেখকগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়। ইনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হন। সমসাময়িক রুশসমাজের নৈরাশ্য ও বেদনা ইনি সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে। প্রবঞ্চিতের ক্ষোভ, দুর্বলের আত্মাবমাননা, দৈনন্দিন জীবনের ব্যর্থতা এঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অন্যান্য রুশ লেখকদের মত ইনি কোন মতবাদ প্রচার করেননি। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে The Cherry Orchard, The Three Sisters ও Uncle Vanya নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে বিদগ্ধসমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে।

হস্তলিপিবিজ্ঞানের শিক্ষক সার্জে ক্যাপিতোনিচ আখিনেয়েভের মেয়ে নাতালিয়ার সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক ইভান পেত্রোভিচ লোশাদিনিখের বিবাহ উপলক্ষে ভোজের উৎসব চলেছে। নাচগান আর হল্লায় বসবার ঘর সরগরম হয়ে উঠেছে। ক্লাব থেকে ভাড়া-করে-আনা খানসামার দল কালো ফ্রক-কোট ও ধূলিমলিন সাদা নেকটাই পরে ইতস্তত ছুটাছুটি করছে ব্যস্তভাবে। অতিথি অভ্যাগত ও চাকরবাকরদের কোলাহলে কান পাতবার জো নেই। বাইরে থেকে এক দল লোক খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে—সামাজিক পদমর্যাদা নেই বলে ভেতরে ঢুকতে ভরসা পায় না তারা।

রাত ঠিক বারোটার সময় গৃহস্বামী আখিনেয়েভ রান্নাঘরে এসে হাজির হলেন—খাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা দেখবার জন্য। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ধোঁয়ায় ভর্তি। ধোঁয়ায় রাজহাঁস ও

অনান্য পশুপক্ষীর মাংসের লোভনীয় গন্ধ। হরেক রকমের খাবার আর পানীয় ছুটো টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে। রাঁধুনী মার্ফা খাবারের টেবিলের কাছে ঘোরাফেরা করছে ব্যস্তভাবে। অত্যন্ত স্থূল তার দেহ, মুখের রঙটা ঘোর লাল।

"স্টার্জনটা কেমন তৈরি কবেছ দেখি," লুব্ধদৃষ্টিতে রান্নাব পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বললেন আখিনেয়েভ—"কী চমৎকার গন্ধ! ইচ্ছে করছে সমস্ত রান্নাঘরটাই গিলে ফেলি! স্টার্জনটা দেখাও তো একবাব।"

মার্ফা একটা বেঞ্চির কাছে গিয়ে চর্বিমাখা একখানা খবরের কাগজ তুলল অতি সাবধানে। কাগজটার নীচে প্রকাণ্ড একটা ডিসে মস্ত একটা স্টার্জন্—তার চারপাশে একবাশ জলপাই আব ক্যারট। স্টার্জন্টাব দিকে তাকিয়ে স্বস্তিব একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আখিনেয়েভ। মাছটা তৈবি হয়েছে খাসা! তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে উঠল আনন্দেব আবেশে। নীচু হয়ে অধর ও ওষ্ঠ সংযুক্ত করে তৃপ্তির একটা আওয়াজ করলেন তিনি-- চলন্ত গাড়ির চাকায় যেমন আওয়াজ হয় তেমনি। এক মুহূর্ত স্থিব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তারপর আনন্দে তুড়ি দিলেন একটা এবং আবার ঠোঁট ছুটো যুক্ত করে আওয়াজ করলেন আগের মত।

"এ্যাঁ! চুমু খাওয়ার আওয়াজ শুনি যে! বলি, কাকে চুমু খাচ্ছো, মার্ফুশকা?" কে একজন বলে উঠল পাশের ঘর থেকে এবং এক মুহূর্ত পরেই স্কুলমাস্টার ভ্যান্কিনের কদম-ছাঁট-দেওয়া মাথাটা দেখা গেল দরজার সামনে।

"কাকে চুমু খাচ্ছিলে, মার্ফা? এ্যাঁ! সার্জে ক্যাপিতোনিচ যে! বুড়ো বয়সেও মনটা বেশ কাঁচা রেখেছ দেখছি! বলিহারি ভাই!··· মেয়েমানুষের কাছে নিরালায় দাঁড়িয়ে কী করছিলে বল তো?"

"চুমু আমি খাইনি মোটেই," হতবুদ্ধির মত জবাব দেন আখিনেয়েভ—"চুমু খাচ্ছিলাম এ কথা তুমি বললে কি করে? মাছটা খাসা রান্না হয়েছে দেখে আমি শুধু একটা আওয়াজ করেছিলাম মুখে।"

"ও কথা আর কাউকে বলো," ব্যঙ্গের সুরে বললেন ভ্যান্‌কিন এবং কথাটা বলেই দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে বিদ্রূপের একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল।

"ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াবে ভগবানই জানেন!" আখিনেয়েভ বললেন মনে মনে—"লোকটা এবার চতুর্দিকে ঐ কথা রটাবে নিশ্চয়। পাজী নচ্ছার কোথাকার! সারা শহরে ওর জন্যে দেখছি মাথা হেঁট হবে আমার।"

ভীত কুণ্ঠিতপদে বসবার ঘরে ঢুকে আখিনেয়েভ বার বার তাকাতে থাকেন ভ্যান্‌কিনের দিকে—ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য করার জন্য। ভ্যান্‌কিন দাঁড়িয়েছিলেন পিয়ানোর কাছে। হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বললেন ইন্‌স্পেক্টারের শ্যালিকার কানে আর অমনি সেই মেয়েটি হেসে উঠল খিল খিল করে।

"আমারই কথা বলাবলি করছে ওরা!" মনে মনে বলেন আখিনেয়েভ, "আমারই কথা নিশ্চয়! লোকটা পাকা শয়তান। মেয়েটা বিশ্বাস করেছে বলেই মনে হচ্ছে, নইলে অমন করে হাসবে কেন? আচ্ছা বিপদেই পড়লাম!...না, চুপ করে থাকলে চলবে না—এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকে ওর কথা বিশ্বাস না করে। সকলের কাছেই ব্যাপারটা আমি বলবো—তা' হলে ও জব্দ হবে খুব—কেউ ওর কথা শুনতে চাইবে না—সকলেই বুঝবে ও কত বড় মিথ্যেবাদী।"

আখিনেয়েভ বার কতক মাথা চুলকোন, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যান পাদেকয়ের দিকে।

"মঁসিয়ে পাদেকয়, একটু আগে আমি ছিলাম রান্নাঘরে—খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম সেখানে," ফরাসী ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ ক'রে বলেন আখিনেয়েভ। কথার খেই হারিয়ে যায় যেন, একটু ইতস্তত করে আবার বলতে শুরু করেন, "আপনি যে মাছ ভালবাসেন তা আমি বিলক্ষণ জানি। এই এত বড় একটা স্টার্জন রান্না হয়েছে—প্রায় চারহাত—খেতে যা হবে!...হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভুলেই-

গিয়েছিলাম আর কি! রান্নাঘরে ঐ স্টার্জনটা নিয়ে ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে। খাবার জিনিসপত্র দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে। স্টার্জনটার দিকে তাকিয়ে ভারি খুশি হল মনটা—চমৎকার রান্না হয়েছে! দেখতে দেখতে হঠাৎ একসময় আনন্দে একটা আওয়াজ করেছি মুখে আর অমনি ঐ বোকা ভ্যান্‌কিনটা এসে ঢুকল ঘরে আর বলল কিনা···হা হা··· বলল কিনা—'তুমি চুমু খাচ্ছিলে. লুকিয়ে।' বুঝুন ব্যাপারটা! আমি চুমু খাবো মার্ফাকে—ঐ রাঁধুনী মাগীকে? লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই একেবারে—নিরেট বোকা! মার্ফাকে দেখেছেন তো? মোটা কদর্য চেহারা---বাঁদরের মত মুখ—আর ভ্যান্‌কিন বলে কিনা আমি চুমু খেয়েছি ওকে! এমন আহাম্মক আপনি দেখেছেন কোথাও?"

"কার কথা বলছ, আখিনেয়েভ? আহাম্মকটা কে?" এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করেন তারান্‌তুলোভ।

"ভ্যান্‌কিনের কথা বলছিলাম। খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে—"

মার্ফা ও স্টার্জন ঘটিত কাহিনীটির পুনরুক্তি করেন আখিনেয়েভ।

"ভ্যান্‌কিনের বুদ্ধির বহর দেখে হাসি পায় আমার। কী বদ্‌ বেয়াক্কেলে লোক বল তো? আমার কি মনে হয় জানো? মার্ফাকে চুমু খাওয়ার চেয়ে কুকুরের মুখে চুমু খাওয়া ঢের বেশী তৃপ্তিকর।" কথাটা শেষ ক'রে মুখ ফেরাতেই দেখা হ'ল মাজ্‌দার সঙ্গে।

"ভ্যান্‌কিনের কথা আলোচনা করছিলাম আমরা। অদ্ভুত ঐ লোকটা! রান্নাঘরে ঢুকে ও আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মার্ফার পাশে আর অমনি আজগুবি গল্প বানাতে শুরু করল আমাদের সম্বন্ধে! বলে কিনা আমরা নাকি চুমু খেয়েছি পরস্পরকে! নেশাটা হয়তো একটু বেশী করেছে আজ, তাই আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে! আমি বললাম ওকে—'আমি বরং হাঁসের মুখে চুমু খেতে রাজী আছি, তবু মার্ফাকে চুমু খাবো না কিছুতেই। তা'ছাড়া আমি তো আর অবিবাহিত নই, আমার স্ত্রী বর্তমান। ওর জন্যে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে আমায়।"

"কে তোমায় হাস্যাস্পদ করলে হে?" আখিনেয়েভকে জিজ্ঞাসা করেন ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক।

"ভ্যান্‌কিন। রান্নাঘরে স্টার্জনটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি—"

সমস্ত কাহিনীটা গড় গড় করে বলে যান আখিনেয়েভ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভ্যান্‌কিন ও স্টার্জন সংক্রান্ত কাহিনীটা সকলের কানেই গেল পৌঁছে।

"এখন ও বলুক আমার সম্বন্ধে যা খুশি," মনে মনে বলেন আখিনেয়েভ। "হ্যাঁ, বলুক যত পারে। ও বলতে শুরু করবে আর অমনই ওকে থামিয়ে দেবে লোকে, 'বাজে কথা বলো না আমাদের কাছে। ব্যাপারটা সবই আমরা জানি।"

আখিনেয়েভ মনে মনে এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভরপুর মদ খাওয়ার পরেও আরও চার গ্লাস ব্রাণ্ডি দিলেন নিঃশেষ করে। মেয়েকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে, নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর স্টার্জন-সংক্রান্ত ব্যাপারটা মনেই রইল না তাঁর। কিন্তু হায়, মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর! দুষ্ট লোকের জিভ তলোয়ারের মত ধারাল আর তার কর্মতৎপরতাও অসাধারণ। বেচারা আখিনেয়েভের সমস্ত কৌশলই হ'ল ব্যর্থ। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। সেদিন বুধবার, ক্লাসে পড়ানো শেষ করে আখিনেয়েভ যখন টিচার্স রুমে এসে ছাত্র ভিসিয়েকিনের অশিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে এগিয়ে এসে ইশারা করে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে।

"দেখুন সার্জে ক্যাপোনিতোনিচ," ঢোক গিলে বলতে শুরু করেন প্রধান শিক্ষক, "ক্ষমা করবেন আমায়। ব্যাপারটা অবশ্য স্কুল সম্পর্কিত নয়, তবু এ সম্বন্ধে কিছু না বলেও পারছি না। এটা আমার কর্তব্য। দেখুন গুজব রটেছে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে অর্থাৎ কিনা আপনার রাঁধুনীর সঙ্গে আপনার নাকি অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। এ

ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছু বলা সাজে না…ওর সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠতা করতে পারেন, ওকে চুমু খেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন, তবে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে অত প্রকাশ্যভাবে করবেন না। ভুলবেন না যে আপনি স্কুলমাস্টার।"

আখিনেয়েভ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—কী যে বলবেন ভেবে পেলেন না। ছুটির পর বাড়ি চললেন অসহ্য জ্বালা নিয়ে—এক ঝাঁক মৌমাছি সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়েছে যেন। পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হতে লাগল সারা শহরের লোক কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে—যেন সর্বাঙ্গে আলকাতরা মেখে রাস্তায় বেরিয়েছেন তিনি।

বাড়িতে পৌঁছেও নিস্তার নেই।

"আজ কিছু খাচ্ছো না যে?" খেতে বসে জিজ্ঞাসা করল স্ত্রী। —"কী ভাবছ একমনে? প্রণয়-দেবতার কথা বুঝি? মার্ফুশকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো আজকাল। ভেবেছ কেউ কিছু জানতে পারবে না? সব টের পেয়েছি আমি। ভাগ্যিস্ পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে এসেছিল আজ! বুড়ো বয়সে এ আবার কি ধিঙ্গীপনা!" ঠাস্ করে সে একটা চড় বসিয়ে দিল আখিনেয়েভের গালে।

খাওয়া শেষ করা হ'ল না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন আখিনেয়েভ, তারপরে টলতে টলতে চললেন ভ্যান্‌কিনের বাড়ির দিকে—মাথায় যে টুপী নেই, গায়ে কোট নেই সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর।

"পাজী বদ্‌মায়েশ!" সজোরে ভ্যান্‌কিনের কলারটা ধরে গর্জন ক'রে ওঠেন আখিনেয়েভ—"দুনিয়াসুদ্ধ লোকের কাছে তুমি আমায় খাটো করেছ কেন? কেন আমার বদ্‌নাম রটালে মিছামিছি?"

"বদ্‌নাম? আমি রটিয়েছি? কী বলছ তুমি?" ভ্যান্‌কিনের চোখ কপালে ওঠে।

"কে তবে সকলকে বললে যে মার্ফাকে চুমু খেয়েছি আমি? তুমি নও…বল তুমি নও? বেল্লিক…বেয়াদব…খুনে কোথাকার!"

ভ্যান্‌কিন হাঁ করে চেয়ে থাকেন আখিনেয়েভের দিকে—মুখে ফুটে

ওঠে একটা অসহায় ব্যাকুলতা। যীশু খ্রীস্টের মূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলেন, "তোমার সম্বন্ধে একটিও কথা যদি আমি কারও কাছে বলে থাকি তাহলে ভগবান যেন শাস্তি দেন আমায়, চোখের দৃষ্টি যেন আমি হারাই, আমার মৃত্যু হয় যেন···আমার ঘর-সংসার যেন ছারখার হয়ে যায়!"

ভ্যান্‌কিনের উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে আখিনেয়েভের নিন্দা রটায়নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

"তবে কে এ কাজ করেছে? কে সে?" পরিচিত সকলেরই মুখ পর্যায়ক্রমে ভেসে ওঠে আখিনেয়েভের মনে আর নিষ্ফল আক্রোশে বক্ষে করাঘাত করে বার বার তিনি গর্জন করেন, "কে সে?"

প্রবঞ্চিত স্বামী

যে মুহূর্তে ফিদর সিগায়েভ জানতে পারলেন, যে স্ত্রী তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অমনি প্রতিশোধ নেবার দুর্নিবার বাসনায় তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অযথা কালক্ষেপ না করে তিনি সটান হাজির হলেন আগ্নেয়াস্ত্র-ব্যবসায়ী স্মাকস্ এ্যাণ্ড কোম্পানীর দোকানে এবং দোকানদারকে বললেন ভাল একটা রিভলবার দেখাতে। মুখে তাঁর ফুটে উঠেছিল রাগ, দুঃখ ও অপ্রতিরোধ্য সংকল্পের চিহ্ন।

"জানি কী আমি করতে যাচ্ছি," মনে মনে বললেন সিগায়েভ। "আমার সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত, বংশের পবিত্রতা বিনষ্ট, জীবনের যা কিছু সুখসাধ চূর্ণ-বিচূর্ণ। পাপ ও দুর্নীতি হয়েছে জয়ী—পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। তাই সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হিসাবে আমাকে এর প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রথমে আমি হত্যা করবো আমার স্ত্রী ও তার প্রণয়ীকে, তারপর নিজেকে······"

এর আগে রিভলবার কোনদিন তিনি কেনেননি, গুলীও ছোড়েন নি কারো ওপর। কিন্তু কল্পনার চোখে তিনি দেখতে লাগলেন সেই গভীর ক্ষত যা তাঁর গুলী সৃষ্টি করবে অপরাধীদের দেহে। তিনি দেখতে লাগলেন লোকের ভীড় আর শবব্যবচ্ছেদাগারের দৃশ্য। প্রবঞ্চিত স্বামীর ক্ষোভ ও বিদ্বেষ নিয়ে কল্পনানেত্রে তিনি দেখতে লাগলেন আত্মীয়স্বজন ও জনসাধারণের ভীতিবিহ্বল মুখচ্ছবি, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর মৃত্যুকালীন দুঃসহ যাতনা, এমন কি খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হত্যার সংবাদের শিরোনামা আর পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

সাদা ওয়েস্ট-কোট-পরা স্থূলোদর খর্বকায় সুচতুর দোকানদার কয়েকটা রিভলবার কাউন্টারের উপর রেখে, সবিনয় হাস্যে মেঝে পা ঘষতে ঘষতে বলল, "দেখুন, আমি আপনাকে এই খাসা রিভলবারটি নিতে বলি। স্মিথ ওয়েসনের সবচেয়ে আধুনিক আবিষ্কার এটি। এমন জিনিস এ পর্যন্ত আর কেউ তৈরী করতে পারেনি। এতে ছটা গুলী ভরা চলবে একসঙ্গে। দেখুন না কী চমৎকার এর গঠন। সবে বেরিয়েছে বাজারে। প্রতিদিনই আমরা দু'চার ডজন বিক্রি করছি খরিদ্দারদের কাছে—চোর-ডাকাত, নেকড়ে বাঘ, আর পারিবারিক শান্তিভঙ্গকারীদের হাত থেকে রেহাই পেতে চায় যারা তাদের কাছে এ জিনিস একেবারে অপরিহার্য। এর গুলী লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করবেই আর সে আঘাতও হবে সাংঘাতিক—এর পাল্লাও অনেক দূর। অবিশ্বাসিনী স্ত্রী ও তার প্রণয়ীকে সাবাড় করতে এর উপযোগিতা অসাধারণ। আর আত্মহত্যা করার পক্ষে, বিশ্বাস করুন স্যর, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর নেই…"

লোকটি একটু নীচু হয়ে রিভলবারটা তুলে ধরে ঘোড়াটা টানল, তারপর লক্ষ্য স্থির কবতে লাগল গভীর মনোযোগের সঙ্গে—তার ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হল যেন সে অন্তরের আবেগ দমন করতে পারছে না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার মুখখানা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে মনে হল, যদি ঐরকম সুন্দর একটি রিভলবার তার নিজের থাকত তাহলে স্বচ্ছন্দে সে একটা গুলী চালিয়ে দিত নিজের মাথার ভিতর দিয়ে।

"এর দাম কত ?" জিজ্ঞাসা করলেন সিগায়েভ।

"পঁয়তাল্লিশ রুবল্।"

"হুম্…দামটা কিছু বেশী বলে মনে হচ্ছে।"

"বেশ—তাহলে অন্য কোম্পানীর জিনিস দেখাচ্ছি, দাম ওর চেয়ে সস্তা। সব রকম দামের জিনিসই আমরা মজুত রাখি। এই রিভলবারটা দেখুন না, ফরাসী দেশ থেকে আমদানি করা। দাম মাত্র আঠারো রুবল্, কিন্তু… (লোকটির মুখ তাচ্ছিল্যে বিকৃত হল) এ একেবারে সেকেলে। এ জিনিস কেনে একটু আধটু বুদ্ধি আছে এমনি সব ইতর শ্রেণীর

লোক আর খেয়ালী মেয়েরা। এ দিয়ে আত্মহত্যা করা বা স্ত্রীকে মারা কদর্য রুচির পরিচায়ক, ভদ্র সমাজে স্মিথ-ওয়েসনই চলে আজকাল।"

"কাউকে মারা বা আত্মহত্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গ্রীষ্মকালে আমি যেখানে থাকি সেখানে চোরের বড় উপদ্রব, ভয় দেখিয়ে চোর তাড়াবার জন্যেই .রিভলবারের দরকার হয়েছে।" —গম্ভীরমুখে নির্জলা মিথ্যাটা বললেন সিগায়েভ।

নিজের অন্ত্যেষ্টির ছবি কল্পনায় আঁকেন তিনি। তিনি যেন কফিনে শুয়ে আছেন, মুখে তাঁর মৃদু হাসির রেখা আর অনুতাপে মলিন বিশীর্ণ তাঁর স্ত্রী শোকাতুরা নায়োবীর মত তাঁর শবযাত্রার সঙ্গে চলেছে। ক্রুদ্ধ জনসাধারণের ঘৃণাভরা দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করবার কোনো জায়গা যেন তার কোথাও নেই।

"তাহলে স্মিথ-ওয়েসনই সবচেয়ে পছন্দ করেন আপনি," দোকানদার হঠাৎ বলে উঠল তাঁর কল্পনায় বাধা দিয়ে। "দামটা যদি বেশী মনে করেন, তাহলে আমি না হয় পাঁচ রুবল কম করেই দেবো। তাছাড়া আমাদের আরও কয়েক রকমেব রিভলবার আছে, এব চেয়ে সামান্য কিছু সস্তা।"

খর্বকায় লোকটি চট্ করে শেলফ্-এব দিকে ফিরে আরো ডজন খানেক রিভলবার নামালো।

"এই দেখুন তিরিশ রুবল দামের একটা। আমাদের মুদ্রাব দাম ভীষণ রকম পড়ে গেছে আর বিদেশ থেকে যে-সব মাল আমদানি হচ্ছে তার ওপর শুল্ক দিন দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই তিরিশ রুবল দাম এমন কিছু বেশী নয়। বিশ্বাস করুন স্যর, আমি নিজে রক্ষণশীল স্বভাবের মানুষ অথচ আমিও এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি না। আপনিই বিচার করুন না, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভালো রিভলবার রাখার বিলাসিতা শুধু বড়লোকদেরই পোষায়। গরীবদের এদেশে তৈরী সস্তা রিভলবারেই খুশী থাকতে হচ্ছে—যেমন ধরুন ঐ যেগুলো টুলায় তৈরী হচ্ছে···আর টুলায় তৈরী রিভলবার,

বুঝেছেন কিনা, একদম রদ্দি। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন অথচ গুলীটা লাগল আপনারই কাঁধে।"

অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর দুঃখযন্ত্রণা তিনি দেখতে পাবেন না এ চিন্তা হঠাৎ সিগায়েভের মনে বেদনার সঞ্চার করল। প্রতিহিংসা তখনই মধুর হয় যখন শত্রুর যাতনা দেখে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ ঘটে। শত্রুর যন্ত্রণাভোগের দৃশ্য দেখার সুযোগ যদি না পাওয়া যায়, ঐ সময় যদি তিনি নিজেই থাকেন কবরের অন্ধকার গর্ভে, তবে এ প্রতিশোধ নেওয়ার সার্থকতা কী?

সিগায়েভ ভাবেন, "আচ্ছা, প্রথমে যদি সেই হতভাগাকে খুন করে ওর অন্ত্যেষ্টি চোখে দেখে তারপর আত্মহত্যা করি তাহলে ভালো হয় না? কিন্তু তার আগেই তো আমায় গ্রেপ্তার করবে পুলিস আর কেড়ে নেবে রিভলবারটা।···তাহলে ঐ বেল্লিকটাকে খুন করা যাক আর আত্মহত্যা না করে পুলিসের হাতে ধরা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আত্মহত্যা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খুন করার পর। পুলিসের হাতে ধরা দিলে জুরী ও জনসাধারণের কাছে স্ত্রীর নীচ স্বভাবের পরিচয় দেওয়ার একটা সুযোগও মিলবে। বোকার মত যদি আত্মহত্যা করি তাহলে ও যেরকম সাহসী আর মিথ্যা কথায় পটু তাতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। তখন সমাজও হয়তো তার কাজের সমর্থন করবে, আর···কে বলতে পাবে, হয়তো আমাকেই বিদ্রূপ করবে। তার চেয়ে যদি বেঁচে থাকি তাহলে···"

এক মুহূর্ত পরে আবার ভাবেন, "হ্যাঁ, আর তাছাড়া যদি আত্মহত্যা করি, তবে সব দোষই হবে আমার, সবাই ভাববে তুচ্ছ সন্দেহের বশে খুন করেছি আমি। আর সত্যিই তো, আত্মহত্যা করবো কেন? তাছাড়া আত্মহত্যা করা কাপুরুষতার লক্ষণ। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, লোকটাকে খুন করবো, স্ত্রীকে দেবো ছেড়ে···আর আমি নিজে ধরা দেবো পুলিসের হাতে। বিচারের সময় ওকে নিশ্চয়ই আদালতে হাজির হতে হবে সাক্ষী হিসেবে। আমার উকিলের জেরায় ওর অবস্থাটা যে কী দাঁড়াবে তা আমি বেশ অনুমান করতে

আমরা এ রকম ক্ষেত্রে কাগজওয়ালাদের ও জনসাধারণের সহানুভূতি আমিই পাবো নিশ্চয়।”

সিগারেত আপন মনে ভাবতে থাকেন, সেদিকে লক্ষ্য না করেই দোকানদার নানা রকমের রিভলবার বের করে ক্রেতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করে।

“এগুলো হচ্ছে ইংলণ্ডে তৈরী রিভলবার, মাত্র কিছুদিন আগে আমদানি হয়েছে এদেশে। কিন্তু—আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন—স্মিথ-ওয়েসনের কাছে এগুলো কিছুই নয়। এই সেদিন—আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন খবরের কাগজে—সেনাবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী স্মিথ-ওয়েসনের একটা রিভলবার কিনেছিলেন আমাদের দোকান থেকে। তিনি গুলী ছোঁড়েন স্ত্রীর প্রণয়ীকে লক্ষ্য করে—জানেন কী হল তার ফলে? গুলী তার বুক ভেদ ক'রে, ব্রোঞ্জের একটা ল্যাম্প ফুটো ক'রে, লাগল গিয়ে একটা পিয়ানোর গায়ে, সেখান থেকে ছিটকে একটা স্প্যানিয়েলকে সাবাড় ক'রে গুলী গিয়ে জখম করল তাঁর স্ত্রীকে। বুঝুন তাহলে রিভলবারের কেরামতিটা! আমাদের দোকানের সুনাম হল এতে। অফিসারটি বর্তমানে রয়েছেন হাজতে। অবশ্য দোষী প্রমাণিত হয়ে তিনি নির্বাসিত হবেন সাইবিরিয়ায় কয়েক বছর দণ্ডভোগ করবার জন্য। তার কারণ, প্রথমতঃ আমাদের আইনগুলো নিতান্ত সেকেলে, আর দ্বিতীয়তঃ জুরী প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পক্ষপাতিত্ব করে প্রণয়ীদের প্রতি। কেন? কারণ বিচারক, জুরী ও সরকারী উকিল সবারই ধর্মশাস্ত্রের দশম নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার একটা গোপন অভিলাষ আছে। আর দেশের একটা স্বামী যদি কমে যায় তবে ওদের উদ্বিগ্ন হবারও কিছু নেই। বলতে কি, আমাদের সমাজই আজকাল এমন যে দেশের সব স্বামীগুলোকে যদি স্যাগ্হালিনে নির্বাসিত করা হয় তাহলে লোকে যত খুশী হবে এমন আর কিছুতেই হবে না। আমাদের সমাজের নৈতিক অধঃপতনের কথা ভাবলে আমার মন যে কী বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তা আর কি বলবো। অপরের সিগার খাওয়া কিংবা অপরের স্ত্রীকে

ভালোবাসাটাও আমাদের সমাজে আজকাল খুব চালু হয়েছে। আমাদের ব্যবসায় মন্দা পড়ছে বছরের পর বছর—তার মানে এই নয় যে আমাদের পারিবারিক জীবন আগেকার চেয়ে পবিত্র হচ্ছে আর দশম নিষেধাজ্ঞার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ছে—এর আসল কারণ হচ্ছে, স্বামীরা আজকাল নিজেদেব অদৃষ্টের কাছে নতি স্বীকার করছে এবং আদালত ও নির্বাসনের ভয়ও তাদের বেড়ে গেছে।”

চতুর্দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করে দোকানদার স্বরটা নীচু করে বলল, “আর এসব ঘটছে কাব দোষে? একমাত্র সবকালেব দোষে।”

“ঐ শূয়োরটাব জন্য স্যাগ্‌হালিনে গিয়ে লাভটা কী?” মনে মনে বললেন সিগায়েভ—“আমি যদি সাইবিবিয়ায় নির্বাসিত হই তাহলে আমাব স্ত্রী আবাব বিবাহ করবে এবং দ্বিতীয় স্বামীকেও প্রতাবিত কববে—তাবই তো হবে জয়, দুঃখ বেদনা তাকে স্পর্শ কবতে পাবেে না।···তাহলে স্ত্রীকেও মাবা হবে না, আত্মহত্যাও নয়, আব সেই শঠ লম্পটকেও খুন কবা নয়। প্রতিশোধেব আর একটা উপায় উদ্ভাবন কবতে হবে—এব চেয়েও কষ্টদাযক অথচ নিবাপদ। ওদের আমি শাস্তি দেবো অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্য দেখিয়ে। তাবপর আনবো বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা যাতে ঐ অবিশ্বাসিনীর ঘৃণ্য চরিত্রেব কথা সাবা জগতে ছড়িয়ে পড়বে আব সে ধিক্কৃত হবে চিরদিনেব মত।”

“এই দেখুন আবো একবকম।” আর এক ডজন বিভলবাব নামিয়ে দোকানী বলল,—“এর ঘোড়ার অদ্ভুত কলকজাব কাজটা দেখুন একবার।”

সিদ্ধান্তে উপনীত হবাব পর রিভলবারে আব কোন প্রয়োজন রইল না সিগায়েভের, দোকান থেকে বেরিয়ে পড়াই এখন তিনি সমীচীন মনে কবলেন। দোকানীব উৎসাহ এদিকে বেড়েই চলেছিল, মাল দেখাতে ক্লান্তি নেই তার।

দোকানীর অপরিসীম উৎসাহ দেখে সিগায়েভ মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেন। বেচারী তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কী চেষ্টাই না করছে! হাসছে, ফিরছে, পা ঘষছে মেঝেতে—বকছেও অনর্গল।

"বেশ, তাহলে আর এক সময় আসবো, নয়তো পাঠিয়ে দেবো আর কাউকে," মৃদু অস্পষ্ট স্বরে বললেন সিগায়েভ।

দোকানীর মুখের দিকে সিগায়েভ তাকাতে পারলেন না—লোকটা কী মনে করল কে জানে! কিন্তু নিজের সঙ্গীন অবস্থাটা কতকটা কাটিয়ে নেবার জন্য কিছু অন্ততঃ কেনা দরকার এটা তিনি অনুভব করলেন মনে মনে। কিন্তু কেনা যায় কী? দোকানের দেয়ালে চোখ বুলোতে লাগলেন তিনি—সস্তা কোন জিনিস বাছাই করবার মতলবে। নজর পড়ল একখানা জালের ওপর—দেয়ালে ঝুলছে দরজার পাশে।

"ওটা···ওটা কী?" জিজ্ঞাসা করেন সিগায়েভ।

"তিতির ধবার জাল ওখানা।"

"ওর দাম কত?"

"আট রুবল্।"

"এই একখানা নিলাম।"

দোকানীর হাতে আট রুবল্ দিয়ে, জালখানা বগলে করে সিগায়েভ বেরিয়ে পড়লেন দোকান থেকে।

অভাবনীয়

আলফঁস দোদে (১৮৪০-১৮৯৭) উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথাশিল্পিগণের অন্যতম। মানবচিত্তের বিচিত্র অনুভূতির ব্যঞ্জনায় ইনি অদ্বিতীয়। এঁর রচনাবলীর মধ্যে Le Nabab, Les Rois en Exil ও Sapho সমধিক প্রসিদ্ধ।

"প্রিয়তম, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

"অনুরোধ? আবার টাকার দরকার হয়েছে বুঝি?"

"সত্যি, টাকার জন্যে বার বার তোমায় বিরক্ত করতে লজ্জা করে। কিন্তু এমনই ওদের অবস্থা যে সাহায্য না করলেই নয়। বাপ হাসপাতালে—দেনার দায়ে ওরা সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। পঞ্চাশ পাউণ্ড ওদের বিশেষ দরকার।"

"তোমার কথা শুনে ওদের ওপর সবারই দয়া হবে। কিন্তু এভাবে আর আমি টাকা খরচ করতে পারি নে। তুমি তো জানোই, এ মাসে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে—হিসেব করে না চললে পরে হয়তো মুশকিলে পড়তে হবে।"

স্বামী মঁসিয়ে দ্য তার্সাক একটু রূঢ়ভাবেই কথাগুলো বলেন, কিন্তু তাঁর ঐ অসন্তোষ স্থায়ী হয় না বেশীক্ষণ। কথা শেষ করেই স্ত্রীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে মৃদু হাসেন তিনি। সুন্দরী স্ত্রীটির ওপর বেশীক্ষণ রাগ করে থাকা তাঁর পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি—নৌ-বিভাগের সৈনাধ্যক্ষ। বাড়িতে থাকেন খুব কম—সমুদ্রের ওপরেই কাটাতে হয় বছরের বেশীর ভাগ সময়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর সময় কাটে দুঃস্থ প্রতিবেশীদের পরিচর্যা করে। এ কাজে তার উৎসাহ এত বেশী যে অত্যন্ত জঘন্য ইতর

পল্লীতেও সে যাতায়াত করে এবং ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে।

লোকে বলে, পিতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই দরিদ্রের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করেছে। পিতা ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, নানারকম দুষ্কর্ম করে লোকনিন্দা ও অপমানের ভয়েই শেষটা তিনি আত্মহত্যা করেন। মেয়ে কিন্তু বাপের সম্পূর্ণ বিপরীত—অতি নির্মল তার চরিত্র। স্বামী তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত—তার নির্মল চরিত্র ও অনুপম লাবণ্য দুই-ই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ম'সিয়ে তার্সাকের অবস্থা বেশ সচ্ছল, কিন্তু খুব বেশী খরচ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র মেয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করা তিনি কর্তব্য বলেই মনে করেন।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করে স্বামী বলেন, "আমাদের যদি কোন সন্তান না থাকতো তাহলে তুমি এখন যা পাও তার চেয়ে অনেক বেশী তোমায় দিতে পারতাম, কিন্তু জান্-এর কথা আমাদের ভাবতে হবে তো—তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট হতে দিতে পারি নে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ, প্রিয়তম। সাংসারিক বুদ্ধি আমার কম।" স্ত্রী হেসে জবাব দেয়।

* * * *

চৌদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে জান্—মাথায় ঘন সোনালি কেশ, নীলাভ চক্ষু—মুখে ম্যাডোনার কমনীয়তা। ঘরের অপর কোণে কি একটা সেলাই নিয়ে সে ব্যস্ত—মা-বাবার কথাবার্তা কানে এসে পৌঁছতেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে উঠে পড়ে। জড়িতকণ্ঠে বলে, "না বাবা, মা যা চান তাই ওঁকে করতে দাও—আমার জন্য তোমরা অত উদ্বিগ্ন হয়ো না। টাকাকড়ি কী হবে আমার? আমি চাই ধর্মোপাসনায় এ জীবন উৎসর্গ করতে, স্কুল ছেড়ে চলে আসার আগেই আমি ঠিক করেছি কন্‌ভেণ্টে ভর্তি হব।"

পিতা সস্নেহে মেয়েকে আলিঙ্গন করে বল্লেন, "এখন তুমি একটু ও ঘরে যাও—তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্য এক সময় আলোচনা করা যাবে।"

"দয়া ধর্ম তোমার চেয়ে জান্‌ বোঝে বেশী!" স্ত্রী শান্তস্বরে অনুযোগ করে।

তার্সাক প্রতিবাদ করেন না, শুধু একটু হাসেন। তারপর স্ত্রীর নরম হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে শুরু করেন, "দেখো, তোমার মনে আঘাত দিতে আমি চাই নে। পঞ্চাশ পাউণ্ড তোমার দরকার—এত টাকা দেওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার ঐ আংটি ক'টা বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারো—এতে আমার সম্মতি আছে, আর আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আস্‌চে মাসে ঐ জিনিসগুলো খালাস ক'রে নেবো।"

"আংটি বন্ধক দেবো?" স্ত্রী বিস্মিতদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চায়।

"দিলেই বা—আস্‌চে মাসেই তো ছাড়িয়ে নেবো।"

"বন্ধু-বান্ধব যখন দেখবে আমার হাতে আংটি নেই তখন তারা ভাববে কি?"

"দুটো থাকলেই যথেষ্ট—ঐ হীরের আংটি আর ··"

"না না, তা হতে পারে না। ঐ আংটিগুলোর সঙ্গে অতীতের অনেক পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ওগুলো হাতছাড়া করলে অপরাধী হতে হবে।"

"তার মানে অলঙ্কারের ওপর তোমার এতটা আকর্ষণ যে তুমি ঐ আংটিগুলো আঙুলে না পরে একদণ্ডও থাকতে পারো না!" স্বামী বিরক্তির সুরে বলেন।

"তুমি ভুল বুঝছ।" তাড়াতাড়ি আংটিগুলো আঙুল থেকে খুলে স্ত্রী গহনার বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়।

"এই দেখো আংটিগুলো বাক্সের মধ্যে সরিয়ে রাখলাম। আংটি পরার ওপর আমার কোন লোভ নেই—বন্ধক দিতে আপত্তি।"

স্ত্রী চলে যাবার পর ম'সিয়ে তার্সাক অন্যমনস্কভাবে গহনার বাক্সটা খুলে অলঙ্কারগুলির দিকে তাকান একবার। বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্ত্রীকে তিনি যে সমস্ত উপহার দিয়েছেন সবই

রয়েছে তার মধ্যে, বিবাহের প্রতিশ্রুতির নিদর্শন সেই স্বর্ণাঙ্গুরী···প্রথম দাম্পত্য কলহ নিষ্পত্তির উপঢৌকন সেই হীরার ব্রেসলেট···সন্তান প্রসবের পর পত্নীর সেই পান্নার দুল···জন্মদিনের ছোট ছোট রকমারি উপহার, বিবাহদিনের স্মারক উপহার সেই সব মণি মুক্তার অলঙ্কার। একগাছা মুক্তার হার তুলে নিয়ে আনমনে তিনি নাড়াচাড়া করেন। হঠাৎ হাত ফস্‌কে সেটা মেঝেয় পড়ে যায়—নিজের অসতর্কতার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে তিনি সেটা তাড়াতাড়ি তুলে নেন—লক্ষ্য ক'রে দেখেন দুটো মুক্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

হঠাৎ সন্দেহ জাগে তাঁর মনে। আসল মুক্তা এত সহজে ভেঙে যায় কি ? আশ্চর্য !···পরক্ষণেই নিজের এ সন্দেহের জন্য মনে মনে তিনি লজ্জিত হন—কিন্তু সন্দেহটা কিছুতেই যেতে চায় না যেন !

অবশেষে তিনি তাঁর পরিচিত জহুরীর দোকানে উপস্থিত হন।

দোকানদার মুক্তাগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বলে, "এ জিনিস আমার দোকানের নয়। আমি যে মুক্তার হার আপনাকে বেচেছি, এ তার অনুকরণ মাত্র।"

এখন তিনি বুঝতে পারেন কেন তাঁর স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে আপত্তি। গহনাগুলো রেখে কেউই যে টাকা দেবে না তা সে জানে—তা'ছাড়া গহনা বন্ধক দিতে স্বামী যদি কোথাও যান তা'হলে তো সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

তাড়াতাড়ি তিনি গৃহে ফিরে আসেন। এতদিন যাকে সত্যনিষ্ঠ বলে জেনে এসেছেন তার এই মিথ্যাচারে মন তাঁর অত্যন্ত বিপর্যস্ত !

বাড়িতে এসে দেখেন, স্ত্রী বাইরে গেছে, তবে শীঘ্রই যে ফিরবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ম'সিয়ে তার্সাক বাইরের ঘরে বসে থাকেন—স্ত্রীর অপেক্ষায়। জান্‌ও বসে থাকে কাছে।

আটটা বেজে যায়। এখনই সে ফিরবে নিশ্চয়। এত দেরী তো কোনদিনই হয় না তার !—তার্সাক মেয়ের কাছে উৎকণ্ঠা গোপন করার চেষ্টা করেন।

হঠাৎ সদর দরজা খোলার শব্দ কানে আসে। কারা যেন কি সব

বলতে বলতে হলের ভিতর ঢুকল। ব্যস্তভাবে উঠে পড়েন তিনি— এক অজানা আশঙ্কায় মন তার চঞ্চল হয়ে ওঠে। দ্রুতপদে অগ্রসর হন হলের দিকে।

হলে ঢুকতেই দেখেন, জন কয়েক লোক তাঁর স্ত্রীকে ধরাধরি করে উপরতলায় নিয়ে যাচ্ছে। সে যে সংজ্ঞাহীন তা বুঝতে কষ্ট হয় না— সঙ্গে একজন ডাক্তার।

* * *

"তেমন কোন বিপদের আশঙ্কা নেই", ধীরভাবে মন্তব্য করেন ডাক্তার। "তবে একটু জ্বর আছে, মাঝে মাঝে হয়তো বিকারের লক্ষণ দেখা যেতে পারে।···ওতে ভয় পাবেন না যেন···মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন উনি, বেঁচে গেছেন শুধু ঐ ঘন চুলের জন্যে।"

"কিন্তু এমনভাবে ওকে আঘাত করল কে?" একটু আশ্বস্ত হবার পর তার্সাক জিজ্ঞাসা করেন—"কখন এ ব্যাপার ঘটল, আর এর কারণই বা কি তা কিছু জানেন?"

ডাক্তারের পিছনে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে এগিয়ে আসে এখন। সে একজন পুলিশ কর্মচারী।

"আমি তখন কোয়ার্তিয়ে দ্য লা শ্যাপেলে ডিউটিতে ছিলাম," সে বলতে শুরু করে, "হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে অর্দানে স্ট্রীটের পোস্ট অফিসের দিকে ছুটে আসছে—চীৎকার ক'রে সে বলছে, ৫৬ নম্বর বাড়িতে খুন হয়েছে। কাছে যেতে শুনতে পেলাম, সে বলছে, যে-লোকটা খুন করেছে তাকে সে দেখেছে ঐ বাড়ি থেকে পালাতে— লোকটাকে সে চেনে—ঐ অঞ্চলের একজন নাম-করা বদ্‌মায়েশ। দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ৫৬ নম্বর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ওটা একটা হোটেল—শহরের যত সব বদ্‌মায়েশ ওখানে আড্ডা জমায়। দোতলার একখানা ঘরে দেখতে পেলাম, বিছানার ওপর একটি মেয়ে অচৈতন্যের মত শুয়ে আছে—দেহ অর্ধনগ্ন। সৌভাগ্যের বিষয় পকেটে তার একখানা চিঠি ছিল—সেই চিঠি থেকেই আমরা তার পরিচয় ও ঠিকানা জানতে পারলাম। ডাক্তার ডাকা হল, পরীক্ষা ক'রে তিনি

বললেন, মেয়েটিকে আমরা অন্যত্র নিয়ে যেতে পারি। আমরাও তাই নিয়ে এলাম এখানে।"

"আততায়ীকে তোমরা কেউ দেখতে পাওনি?"

"না। যে-কোনো মুহূর্তেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।"

"তবে এখনও তাকে গ্রেপ্তার করো নি কেন?"

লোকটি ইতস্তত করে। তারপর তার্সাককে একপাশে ডেকে নীচু গলায় বলে, "দেখুন, এ ব্যাপার সম্বন্ধে চুপ ক'রে যাওয়াই কি ভাল নয়? এরকম একটা ব্যাপারে আপনার নাম যদি খবরের কাগজে ছাপা হয়, তা'হলে আপনার সম্মান···পদমর্যাদা··"

"আমি বেশ বুঝতে পারছি," তার্সাক উত্তেজিতভাবে বলে ওঠেন, "পরোপকার করতে গিয়েই আমার স্ত্রী দুর্বৃত্তদের ফাঁদে ধরা পড়েছে—তারা ওর ওপর নির্যাতন করেছে টাকার লোভে। তারা হয়তো ভাবছে আদালতে যেতে ভয় পাবো আমি···কিন্তু আমি অত ভীরু নই, শাস্তি ওরা কিছুতেই এড়াতে পারবে না।"

"কিন্তু এ নিয়ে হৈ চৈ করা ঠিক হবে না মোটেই।"

"ওসব কথা আমি শুনতে চাই নে। আমি তোমায় আদেশ করছি, অপরাধীর সন্ধান ক'রে যথাসম্ভব শীঘ্র আমায় খবর দেবে।"

"তাই হবে। আপনার যদি তাই ইচ্ছা হয়, আমরা আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তবে একটা কথা—এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করবার আগে আমার অনুরোধ আপনি একবার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবেন। আমি যা ইঙ্গিতে জানাতে পেরেছি, তিনি হয়তো সে-সম্বন্ধে এমন সব তথ্য দিতে পারেন যাতে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ বদ্‌লে যেতে পারে।"

আর কিছু না বলে লোকটি বিদায় নেয়। তার্সাকের মনে ভয় ও সন্দেহ জাগে যেন। লোকটি কী বলতে চায়?

তার্সাক উপরতলায় উঠে যান—স্ত্রী কেমন আছে দেখবার জন্যে।

দেখেন ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটেছে তার—শুধু যে অসুস্থ তা নয়, অন্য বিষয়েও সে একেবারে বদ্‌লে গেছে!·· মনে হয় যেন তার ঐ

আকস্মিক পীড়া তার মুখোসটাকে খুলে নিয়ে তার সত্যকারের রূপ তাঁর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছে।···

হঠাৎ সে শয্যায় উঠে বসে কি সব বলতে শুরু করে—কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ও খাপ্‌ছাড়া।

ডাক্তার এগিয়ে আসেন।

"সবাইকে এখান থেকে সরে যেতে বলুন," ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলেন, "আপনার স্ত্রীর এই প্রলাপোক্তি অত্যন্ত পীড়াদায়ক।"

"তার অর্থ?"

"গাড়ি করে আমরা যখন ওঁকে নিয়ে আসছি তখন উনি প্রলাপ বকছেন। যে-সব কথা উনি তখন বলছিলেন তা শুনলে সাধারণ লোক হয়তো অবাক হয়ে যাবে।"

"কেন—অবাক হবে কেন?"

"বিকারের ঘোরে শান্ত নিরীহ মেয়েরাও যা-তা প্রলাপ বকে—অত্যন্ত বিশ্রী অশিষ্ট ভাষাও তাদের মুখ থেকে বেরোয়। এটা···এটা হচ্ছে বিকারেরই একটা লক্ষণমাত্র।"

"আপনি কি বলতে চান যে আমার স্ত্রী···"

"আমি বলছি কি একজন নার্স ডেকে আনা ভালো," ডাক্তার ধীরভাবে বলেন, "আর আপনি নিজেই যদি যান তো আরও ভালো হয়।"

"কেন, আমি অনায়াসে কাউকে পাঠাতে পারি··"

"এই কার্ডের ওপর ঠিকানা আছে—এই বেলা চলে যান—"

হঠাৎ তার্সাকের মনে ধারণা হয়, এ যেন তাঁকে বিদায় করবার কৌশল।

কিন্তু কেন ওরা তাঁকে বিদায় করতে চায়? কী সে রহস্য যা ওরা তাঁর কাছে গোপন করছে?···তার্সাকের জিদ্ চেপে যায়। বলেন, "আমার যাওয়া সম্ভব হবে না—কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

হঠাৎ স্ত্রীর দিকে একটু ঝুঁকে কি যেন লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি।

"দেখো তো ডাক্তার, ঠোঁটে রুজ মাখানো রয়েছে না? মুখে পাউডার, ভুরু রঙ দিয়ে আঁকা।...আশ্চর্য! আমার স্ত্রী তো এসবে অভ্যস্ত ছিল না কোনদিন!"

ডাক্তার অন্যদিকে মুখ ফেরান—চাঞ্চল্য গোপন করার জন্য।

হঠাৎ রোগিনী চোখ মেলে তাকায়। রঙ দিয়ে আঁকা ভুরুর নীচে বিস্ফারিত চোখের বিহ্বল দৃষ্টি!...ভীত উদ্বিগ্নমুখে দুজনে তার মুখের পানে চেয়ে থাকেন—তার কথা বলার অপেক্ষায়।

"আমি এসেছি, বন্ধু!" চাপা মিহি গলায় সে বলতে শুরু করে, "দেখো, তোমার আদেশ পালন করেছি আমি...তোমাকে খুশি করবার জন্যে কেমন সেজে এসেছি!...বল তো আজ আমায় মেসালিনার মত দেখাচ্ছে কি না? ..আমি জানি এসব তোমার ভাবী পছন্দ..."

ডাক্তার তার্সাকেব হাত ধবে টানেন।

"বাইবে যান আপনি ..আমি একাই রোগিনীকে দেখতে পারবো।"

ডাক্তারেব কথায় তার্সাক কান দেন না।

"সব কথা আমি শুনবো—সব কথাই। শোনার অধিকার আমার আছে।" তার্সাকের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

* * *

আবার তাঁর স্ত্রী বকতে শুরু করে। হঠাৎ তাব স্বর বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে—

"আমায় মারো...তিবস্কার করো ..কিন্তু ত্যাগ কবো না আমায় .. আমি তোমায় ভালবাসি...তোমায় ছেড়ে বাঁচবো না আমি...শপথ ক'রে বলছি, আমার কাছে এখন এক কপর্দকও নেই...রাগ ক'রো না তুমি, শীঘ্রই কিছু টাকা তোমায় জোগাড় ক'রে দেবো...মিনতি করছি, রাগ ক'রো না—আসল হীরাজহরতগুলো যদি আমার থাকতো—কিন্তু সব আমি বেচে দিয়েছি—প্রিয়, তোমার চিঠিগুলি কতবারই না পড়ি, পড়ে যেন আশ মেটে না—কী সুন্দর; কী মাধুর্যভরা—"

আর কিছু শোনবার অপেক্ষা করেন না তার্সাক। পাশের ঘরে গিয়ে স্ত্রীর দেরাজটা খুলে ড্রয়ারের ভিতরকার কাগজপত্র পরীক্ষা

করতে থাকেন ব্যস্তভাবে। খানিক পরে একরাশ কাগজের ভিতর থেকে বের করে আনেন সিল্কের ফিতা বাঁধা একতাড়া চিঠি। প্রত্যেক চিঠির উপবে পুরুষের হস্তাক্ষরে লেখা তাঁর স্ত্রীর নাম। এইগুলোই তাঁর দরকার।

চিঠিগুলো তিনি পড়তে শুরু করেন। কোন চিঠিতে অতীত বিলাস-রজনীর অফুরন্ত আনন্দের কথা, কোনটায় ভাবী মিলনের প্রতিশ্রুতি, কোনটায় বা টাকার তাগাদা। চিঠি পড়তে-পড়তে তার্সাক শুনতে পান, মাঝে মাঝে স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠছে—তার গোপন জীবনের ইতিহাস অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রলাপের মধ্যে।—মেসালিনা—হ্যাঁ, সে মেসালিনাই বটে! ঘৃণ্য প্রণয়লীলাই ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

টলতে টলতে তার্সাক ডাক্তারের কাছে ফিরে আসেন।

"ডাক্তার, আর আমি শুনতে পারছি না। তুমি ওকে শান্ত করো। মর্ফিয়া—হ্যাঁ, মর্ফিয়া দাও না ওকে—যাতে ও আব কথা বলতে না পারে।"

"মর্ফিয়া!" ডাক্তার বিস্মিত দৃষ্টিতে তার্সাকের মুখের পানে তাকান। "আপনি কি পাগল হলেন নাকি? এখন উনি এত দুর্বল যে মর্ফিয়া দিলে ওঁর মৃত্যু হবে।"

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার বিদায় নেন, স্ত্রীও ঘুমিয়ে পড়ে, তার্সাক ঐ কদর্য চিঠিগুলি একটি একটি করে পুড়িয়ে ফেলেন।

মায়ের গোপন পাপাচারের কথা যদি সে কোনদিন টের পায়, তবে তাঁর মেয়ে—নির্মল নিষ্কলঙ্ক ঐ জান্—কী মনে করবে? এই নারীর সাহচর্য কি ঐ নিষ্পাপ কিশোরীর পক্ষে শুভকর হবে? কী অজুহাতেই বা তিনি তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবেন?

তার্সাক ধীর সংযতভাবে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে আলোচনা ক'রে কর্তব্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সারা রাত চিন্তায় কেটে যায়।

প্রভাতের ক্ষীণ পাণ্ডুর আলো যখন বাতায়নপথে দেখা দেয় তখন তার্সাক ধীরে ধীরে উঠে ঘরের কোণে ছোট একটি দেরাজের কাছে উপস্থিত হন। দেরাজটি খুলে একটি সিরিঞ্জ বের করে হলদে রঙের

একটা তরল পদার্থ ভরে নেন তার মধ্যে। এতটুকু চঞ্চল না হয়ে—অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত ধীর অবিচলিতভাবে—স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ান, তারপর তার বাঁ হাতখানা তুলে ধরে সিরিঞ্জের তরল পদার্থ সঞ্চালিত করে দেন দেহের মধ্যে।

খানিক পরে স্ত্রীর মুখখানা পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দেন—তার কলঙ্কিত জীবনের ছাপ নিঃশেষে মুছে দিতে। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্ত্রীর হাতদুখানা তুলে ধীরে ধীরে যুক্ত করে দেন।

প্রবল চেষ্টায় দেহটাকে সোজা ক'রে স্থির পদক্ষেপে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে যান এবং সশব্দে দরজাটা উন্মুক্ত করেন।

"জান্!" চীৎকার করে ডাকেন তিনি, "জান্! এদিকে এসো—তোমায় এখন সাহস সঞ্চয় করতে হবে···তোমার মাকে—হতভাগিনী মাকে বিদায় জানিয়ে যাও।"

ভালো করে ঘুমোও

আধুনিক রুশ সাহিত্যে হাস্যরসের গল্প লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, মাইকেল জশচেন্‌কো (Michæl Zoshchenko) তাঁদের অন্যতম। এঁর প্রকাশভঙ্গী যেমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাষাও তেমনি সরল ও অনাড়ম্বর। পথে ঘাটে সাধারণ লোকে যে-ভাষায় আলাপ-আলোচনা করে, সেই আ টপৌরে ভাষাতেই ইনি গল্প লিখে থাকেন। বক্ষ্যমাণ গল্পটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সত্যি কথা বলতে কি, ভ্রমণের উৎসাহ আমার মোটেই নেই। পথে বেরিয়ে, আর কোনো অসুবিধা হোক আর নাই হোক, রাতের বেলা আশ্রয় মেলা ভার। দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাতে একটা আস্তানা না হলে চলে না।

কতবার কত কাজে বাইরে যেতে হয়েছে আমায়, কিন্তু মাত্র দুটি বার স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছি হোটেলে। তাও আবার শেষবারটা হোটেলে স্থান পাই কতকটা বরাত-জোরে। হোটেলের ম্যানেজার ভুল করেছিলেন আমার সম্বন্ধে—আরেকজনের আসবার কথা ছিল, তিনি ভাবলেন আমিই বুঝি সেই লোকটি। অবশ্য পরের দিনই ভুলটা তাঁর ভাঙে, আমায় যেতে বললেন তিনি, তবে আমি তখন যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে আছি।

কিন্তু প্রথমটা ওদের আদর-আপ্যায়নে কী আশ্চর্যই না হয়েছিলাম আমি! একটা গোলাপের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হোটেলের দারোয়ান বলল, "দেখুন, আপনার ঘরটার সামান্য একটা গলদ আছে। গোড়ায় সাবধান করে দেওয়া ভালো। ওর একটা জানালা ভাঙা। রাত্রে যদি একটা বেড়াল ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ে, আপনি ঘাবড়াবেন না যেন।"

"কিন্তু বেড়ালটা ভেতরে লাফ দিতে চাইবে কেন?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি, "একটা কিছু উদ্দেশ্য থাকা চাই। বাস্তবিক, তোমার কথায় আশ্চর্য না হয়ে পারছি না"

দারোয়ান আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, "জানালার ওধারে জঞ্জাল জড়ো করা আছে বিস্তর। জানোয়ারের বুদ্ধি তো? জঞ্জালের ওপরে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একসময় লাফিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে—বুঝতে পারে না ঘর ও বাইরের পার্থক্য, ভাবে সবই বুঝি এক।"

অবশ্য ঘরের ভেতর যখন ঢুকলাম তখন বেড়ালের মনস্তত্ত্বটা অনুধাবন করতে দেরি হল না আমার। সত্যি, বেড়ালের পক্ষে ভুল করাটা খুবই স্বাভাবিক। জঞ্জালের স্তূপ এসে ঠেকেছে একেবারে জানালার কার্নিশ পর্যন্ত—কোথায় যে একের শেষ ও অপরের আরম্ভ তা বোঝা ঐ অবোধ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

ধনী আমি নই আর ধনীর মত বিলাসও কামনা করি না আমি, তবু এ কথা না বলে পারছি না যে, হোটেলে আমার জন্যে যে ঘরটি নির্দিষ্ট হয়েছিল তা দেখে ভারী দমে গেল মনটা।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, ঘরের মাঝখানটায় বেশ খানিকটা জল জমে রয়েছে। জলটা মুছে নেবার জন্যে চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি শুরু করলাম, কিন্তু কেউই এল না। অগত্যা গেলাম দারোয়ানের কাছে।

দারোয়ান বলল, "আপনার ঘরে যদি জল জমে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কেউ ওখানে জল ফেলেছে নিশ্চয়ই। আজ বাড়তি লোক কেউ নেই, কিন্তু কাল আমি হুকুম দেবো ঘরের জলটা মুছে ফেলবার জন্য—তবে কাল সকালের মধ্যেই সম্ভবত জলটা শুকিয়ে যাবে, এখানকার আবহাওয়া বেশ গরম।"

"তা যাই বল," অসন্তোষের সুরে বললাম আমি, "ঘরটা মোটেই স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়। আলো-বাতাস কম, তাছাড়া আসবাবপত্রও বিশেষ কিছু নেই—একটা চেয়ার, বিছানা আর একটা বাক্স। অবশ্য সব হোটেলই সমান নয়—এক এক জায়গায় এক এক রকম ব্যবস্থা।...

কিছুদিন আগে এক হোটেলে ছিলাম এক রাত্রি, কম্বলের বদলে তারা দিয়েছিল টেবল্-ক্লথ—”

“অতদূর আমরা এগোইনি এখনো,” বাধা দিয়ে দারোয়ান বলল, “তবে বিছানার চাদরের বদলে ছোট ছোট টুকরো ব্যবহার করে থাকি। আর ঐ অন্ধকারের কথা যা বললেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আপনি তো আর ঐ ঘরের মধ্যে গহনার নক্সা করবেন না—কী এসে যায় অন্ধকারে?...এসব বাজে অনুযোগ ক'রে কর্তৃপক্ষকে বিরক্ত করার বদলে ভালো ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা দেখুন গে—ঘুমিয়ে পড়লে আর কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই আপনাকে পীড়া দেবে না।”

ওর সঙ্গে তর্ক করে মেজাজ গরম করতে ইচ্ছা হল না আমার, ফিরে এলাম ঘরে। তারপর পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

কী যে ঘটছে প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মনে হল আমি যেন গড়িয়ে পড়ছি বিছানা থেকে।

বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ছি কেন, ইচ্ছা হল জানবার। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পা দুটো জড়িয়ে গেল বিছানার চাদরে। বুঝতে দেরি হল না, চাদরে যে-সব বড় বড় ছিদ্র রয়েছে তারই ভেতর পা গেছে আটকে। কোনরকমে পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে জ্বেলে দিলাম আলো। বিছানাটা পরীক্ষা করতে লাগলাম ভালো ক'রে।

লক্ষ্য করলাম, স্প্রিং-এর গদিটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে, কাজেই ওর ওপর সোজা হয়ে শুয়ে থাকা অসম্ভব। বালিশটা তুলে এনে রাখলাম পায়ের দিকে, তার নীচে ঢুকিয়ে দিলাম স্যুটকেসটা, তারপর শোবার মানসে বিছানায় ঢুকলাম উল্টো দিক থেকে।

কিন্তু এখন দেখলাম আমি ঠিক শুয়ে নেই, বসে আছি বিছানায়—বিছানার মাঝখানটা নেবে গেছে ব'লে পা দুটো ছড়ানো সম্ভব হয়নি। কাজেই ওভার-কোট আর হাত-ব্যাগটা তুলে এনে বিছানার মাঝখানে দিলাম বসিয়ে। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম খানিকটা ঘুমিয়ে নেবার জন্যে।

সবে যখন তন্দ্রাকর্ষণ হয়েছে, ঠিক সেই সময় ছারপোকা কামড়াতে শুরু করল। দু-তিনটে ছারপোকার কামড়ে আমার অবশ্য ভয় পাবার কিছু ছিল না, কিন্তু দেখলাম, ছারপোকার একটা প্রকাণ্ড দল এসেছে আক্রমণ করতে।

প্রথমটা আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম, কিন্তু মিনিট দুই-তিনের মধ্যে ভয়টা কাটিয়ে উঠে লড়াই শুরু করলাম। সারি দিয়ে শত্রুপক্ষ আসে আক্রমণ করতে, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি তাদের ওপর। এমনি করে লড়াইটা যখন খুব তীব্র হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় আলোটা হঠাৎ গেল নিবে।

অন্ধকারে আততায়ীর সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভব নয় ব'লে, আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলাম চিন্তান্বিতভাবে। হঠাৎ কাঠের পার্টিশানে সজোরে ধাক্কা দিল কে এবং সঙ্গে-সঙ্গে রুক্ষ মেয়েলী গলায় তীব্র একটা ঝঙ্কার শোনা গেল—"তোমার মতলবটা কী? রাতদুপুরে পাগলের মত ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করছ কেন?"

প্রথমটা ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ শুরু করে দিলাম প্রতিবেশিনীর সঙ্গে।

আমাদের মধ্যে তখন যে বাক্যালাপ হল সেটা আর বর্ণনা করতে চাই না, কেননা আমরা দুজনেই তখন এত উত্তেজিত যে, পরস্পরকে যে ভাষায় আপ্যায়িত করলাম তা ভদ্রসমাজে বলা চলে না।

"একবার যদি সুবিধা পাই আমি," প্রতিবেশিনী অবশেষে বলল, "তোমায় ভালোরকম শিক্ষা দিয়ে দেবো?"

এর একটা কড়া জবাব দেবার ইচ্ছা হল আমার, কিন্তু বুদ্ধিমানের মত সামলে নিলাম নিজেকে। আমি শুধু বাক্সটা তুলে দেওয়ালের গায়ে দিলাম ছুঁড়ে—যাতে ও ভাবে আমি গুলী ছুঁড়ছি ওর দিকে। এর পরই চুপ করে গেল প্রতিবেশিনী।

দেওয়ালের কাছ থেকে শয্যাটা নিলাম সরিয়ে। তারপর জলের বোতলটা নিয়ে শয্যার চারদিকে বৃত্তাকারে জল ছড়িয়ে দিলাম

মাটিতে, যাতে ঐ দুশমন ছারপোকাগুলো আমাকে আর আক্রমণ করতে না পারে। তারপর শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

সবে একটু ঘুমের আমেজ এসেছে, এমন সময় পার্টিশানের ওধার থেকে কানে এল নারীকণ্ঠের এক ভয়ার্ত চীৎকার।

প্রতিবেশিনীকে উদ্দেশ করে গলাটা বেশ চড়িয়েই বললাম, "তুমি যদি আমার ঘুম ভাঙাবার জন্যে ইচ্ছে করে চীৎকার করে থাকো, তাহলে এ বেয়াদবির শাস্তি কালই তোমায় পেতে হবে।"

তারপর আবার শুরু হল বাগ্‌যুদ্ধ। কথা-কাটাকাটির সময় জানতে পারলাম, বেড়ালটা তার ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল বাইরে থেকে, আর সেইজন্যেই সে চেঁচিয়ে উঠেছিল ভয় পেয়ে।

বুঝতে পারলাম, সেই নির্বোধ দারোয়ানটা যা বলেছিল তা ভুল। সে বলেছিল, বেড়ালটা লাফিয়ে পড়তে পারে আমার ঘরের মধ্যে, কিন্তু আমার জানালা আস্তই ছিল আর ভাঙা ছিল প্রতিবেশিনার ঘরের জানালাটা।

সুতরাং ঝগড়াটা মুলতুবি রেখে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনের মধ্যে উদ্বেগ থাকায়, কেবলই এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম, ফলে যখনই পাশ ফিরি—স্প্রিং-এর গদিটা এমনি একটা বিশ্রী আওয়াজ করে যে, ঘুমটা আসতে-না-আসতেই উবে যায়।

ভোর হতে আর দেরি নেই--অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে। গদিটা শয্যা থেকে তুলে এনে মেঝেয় রাখলাম। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তার ওপর শুয়ে পড়লাম হাত-পা ছড়িয়ে। এতক্ষণে যেন আরাম পাওয়া গেল—মনে হল, এইবার হয়তো চোখের পাতা বুজোতে পারা যাবে।

"ঘুমোও ভালো ক'রে—আরেকজন অপেক্ষা করছে তোমার বালিশের জন্যে," মনে মনে বললাম আমি, গতবছরে দেখা দেওয়ালের গায়ে ঐ ধরনের একটি বিজ্ঞপ্তি স্মরণ ক'রে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই করাতের একটা বিশ্রী ঘস্ ঘস্ আওয়াজ আসতে লাগল জানালার বাইরে থেকে!

সুতরাং পরের দিন যখন আমি হোটেল ত্যাগ করলাম তখন

আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, আর কখনও ঐ হোটেলে বা ঐ শহরে পদার্পণ করবো না। কিন্তু আমার সঙ্কল্পে কি আসে যায়, ভাগ্যদেবীর বিধান অন্যরকম।

ট্রেনে ষাট মাইল ভ্রমণের পর আবিষ্কার করলাম, হোটেলের দারোয়ান আমায় যে পাসপোর্ট দিয়েছে, সেটা আমার নয়। আর যেহেতু পাসপোর্টটা জনৈকা মহিলার, আমার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

পরদিন হোটেলে ফিরলাম। অবশ্য প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা করতে প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, কিন্তু সে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল না বেশী। আমারই মত সেও হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এসেছে—আমার পাসপোর্টটা নিয়ে।

প্রতিবেশিনী পরমা রূপসী, সাতাকুদের [illegible]। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের আলাপ বেশ জমে উঠল, বাকি [illegible] গেলাম ভালে।

অতএব হোটেলে থাকা একেবারে বেফায়দা নয়, মাঝে মাঝে কেউ কেউ লাভবানও হয়।

শিশু ও বৃদ্ধ

এ গল্পের রচয়িতা ইভান ক্যানকার (১৮৭৬-১৯১৮) যুগোস্লাভিয়ার একজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে এঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। স্কুলের পড়া শেষ করে স্থাপত্যশিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইনি ভিয়েনা শহরে এক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই সে স্থান ত্যাগ করে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হন। ভিয়েনা শহরে তেরো বৎসর অতিবাহিত করার পর ইনি অস্ট্রিয়ায় চলে যান এবং ঐখানেই এঁর মৃত্যু হয়। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Erotica (কাব্যগ্রন্থ), Vignettes (ছোট গল্পের সংকলন), Parables from My Dreams ও My Life (অসমাপ্ত আত্মজীবনী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে শিশুগুলি গল্প করে নিজেদের মধ্যে। প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ডের একপাশে বসে গল্প করে ওরা। সন্ধ্যার ধূসর স্বপ্নালু আলো উঁকি দেয় জানালার ফাঁক দিয়ে। ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে রহস্যময় ছায়াগুলি নিঃশব্দে ওঠে উপরদিকে।

যা ওদের মনে উদয় হয় তা-ই নিয়ে গল্প করে ওরা। তবে ওদের গল্পে নেই দুঃখ-বেদনার স্পর্শ, আছে শুধু উচ্ছল আনন্দের হিল্লোল। সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণের মত উজ্জ্বল ওদের গল্প, প্রাণচাঞ্চল্যে সতেজ। ওদের দৃষ্টির অন্তরালে জীবনের যে বিচিত্র স্রোত বয়ে চলেছে, আলোছায়ার যে অপরূপ লীলা চলেছে নিরন্তর, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৌতূহল নেই ওদের। মাঝে মাঝে দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয় ওদের কানে এসে পৌঁছয়, তা নিয়ে আলোচনাও করে ওরা, কিন্তু তার মর্ম ঠিক বোঝে না। ওদের গল্পের না আছে শুরু, না আছে শেষ। কোন ধরাবাঁধা রূপও নেই ওদের গল্পের। কখনও কখনও ওরা চারজনই কথা শুরু করে একসঙ্গে, অথচ

কেউই সেজন্য বিভ্রান্ত হয় না। ওদের মুগ্ধদৃষ্টি যেন এক অপার্থিব আলোকের মাঝে সর্বক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকে যেখানে প্রতিটি শব্দের অর্থ সহজ ও সুস্পষ্ট, প্রতিটি গল্পেরই পরিণতি গৌরবময়।

সেদিন অপরাহ্নে এক অজানা জায়গা থেকে অতর্কিতে যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি এসে নির্মম আঘাত হানল ওদের ঐ আনন্দের স্বর্গলোকে। ডাকে খবর এল ওদের পিতার 'পতন' ঘটেছে ইতালীর এক যুদ্ধক্ষেত্রে। ব্যাপারটা ওদের কাছে অজানা, একান্ত দুর্বোধ্য। পিতার এই আকস্মিক মৃত্যু যেন এক বিরাট দৈত্যের মত তার সুদীর্ঘ বিপুল কলেবর নিয়ে ওদের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার চেহারা নিতান্ত অস্পষ্ট, চোখ মুখ কিছুই নেই তার। মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় নেই ওদের, মৃত্যুকে ওরা দেখেনি কোথাও—গীর্জার সুমুখে আব রাজপথের উপর ঐ যে কোলাহলমুখর জীবন, ওখানে মৃত্যু নেই, আবার এই যে অগ্নিকুণ্ডের ছায়াময় উষ্ণ আলো, এখানেও মৃত্যুর অস্তিত্বের পরিচয় মেলে না। ওদেব গল্পেব যে জগৎ তার মাঝেও মৃত্যু কোনদিন পদক্ষেপ করেনি।

মৃত্যু যে আনন্দের ব্যাপার নয় তা ওরা বুঝতে পারে, কিন্তু এটা যে বিশেষ দুঃখজনক তা ওবা ভাবতে পাবে না মোটেই। মৃত্যু ওদের কাছে নিরবয়ব প্রাণহীন এক মূর্তিমাত্র—ওর চোখ নেই, কোথা থেকে ও এসেছে, কেন ওর আগমন তা ও প্রকাশ করতে পারে না দৃষ্টিতে, ওর মুখ নেই, কথা বলে ও বোঝাতে পারে না কাউকে।

মৃত্যু সম্বন্ধে ওরা ভাবতে পাবে না কিছুই। মৃত্যুর বিবাট মূর্তির সামনে ওদের ভীরু চিন্তা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে—যেন এক প্রকাণ্ড কালো প্রাচীরে বাধা পেয়ে। হতবুদ্ধির মত ওরা তাকিয়ে থাকে পরস্পরের মুখের দিকে।

"বাবা ফিরে আসবেন কবে?" জিজ্ঞাসা করে তন্‌চেক বিমূঢ়ভাবে।

লোইজকা ভুরু কুঁচকে তাকায় ওর দিকে। উষ্মার সঙ্গে বলে, "বাবার যদি পতন হয়ে থাকে, তবে তিনি আসবেন কি করে?"

সবাই চুপ করে যায়। মৃত্যুর বিশাল কালো প্রাচীর ওদের দৃষ্টি অবরোধ করে দাঁড়িয়ে—ওধারের খবর ওদের জানা নেই।

"আমিও যুদ্ধ করতে যাবো," নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করে সাত-বছরের মাতিচে—যেন এতক্ষণে সঠিক চিন্তাটা মাথায় এসেছে ওর। এক্ষেত্রে এ ছাড়া আব কিছু বলা যেন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

"যুদ্ধে যাবার মত বয়স হয়নি তোমার—তুমি খুবই ছোট," ভর্ৎসনার সুরে বলে চার বছরের টনচেক।

"যুদ্ধটা কিরকম, বলো না, মাতিচে! আমার শুনতে ইচ্ছে করে।" অন্ধকাব কোণ থেকে ছোট্ট মিল্‌কার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়। ওদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে শীর্ণ ও দুর্বল, মায়েব পশমী চাদবটা ওর সর্বাঙ্গে জড়ানো, দূব পথেব যাত্রীব পিঠে বোচকাব মত দেখাচ্ছে ওকে।

"যুদ্ধটা কিবকম, শুনতে চাও," উৎসাহভরে বলতে শুরু কবে মাতিচে, "যুদ্ধটা হচ্ছে এই বকম। সবাই ছুরি নিয়ে আঘাত করে পবস্পবকে, তলোয়াব দিয়ে কেটে ফেলে, বন্দুক নিয়ে গুলী করে। যত বেশী লোককে ঘায়েল কবতে পাববে তুমি, ততই তোমার বাহাদুবি। কেউ কিছু বলে না কাউকে, শুধু তেড়ে আসে মারবার জন্য।"

"কিন্তু কেন ওরা ছুবি মাবে পবস্পরকে, তলোয়ার দিয়ে কেটেই বা ফেলে কেন?" গভীব অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে প্রশ্ন করে মিল্‌কা।

"সম্রাটের জন্যে!" উত্তব দেয় মাতিচে গম্ভীরভাবে। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই চুপ করে যায়।

সম্রাট কী ওরা বোঝে না—ওদের বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে শুধু ভেসে ওঠে এক বলদৃপ্ত মহিমাময় পুরুষের ছবি। স্তব্ধভাবে বসে থাকে ওরা, নিঃশ্বাস পড়ে না যেন—গীর্জায় উপাসনারত জনতার মত।

কয়েক মুহূর্ত পরে মাতিচে সংযত করে নেয় নিজেকে—সম্ভবত ঐ দুঃসহ স্তব্ধতা দূর করার জন্য।

"আমিও যুদ্ধে যাচ্ছি—শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে।"

"শত্রুকে দেখতে কি রকম ? ওর শিঙ আছে কি ?"

মিল্‌কার ক্ষীণ কণ্ঠ বেজে ওঠে আবার।

"নিশ্চয়ই আছে—নইলে ও শত্রু হবে কি করে ?" গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে তন্‌চেক।

সঠিক জবাবটা মাতিচেরও জানা নেই। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, "শিঙ আছে বলে মনে হয় না আমার।"

"শিঙ ওর থাকবে কেন ? ও তো আমাদেরই মত একজন মানুষ," ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে লোইজকা। তারপর কি যেন ভেবে ধীরভাবে বলে, "তবে ওর আত্মা নেই।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তন্‌চেক প্রশ্ন করে, "কিন্তু যুদ্ধে মানুষের পতন হয় কি করে ? এমনিভাবে পিছন দিকে হেলে ?" সঙ্গে-সঙ্গে ও পতনের ভঙ্গী করে দেখায়।

"ওরা হত্যা করে তাকে !" ধীরকণ্ঠে জবাব দেয় মাতিচে।

"বাবা আমাকে একটা বন্দুক এনে দেবেন বলেছিলেন," চিন্তিত-ভাবে বলে তন্‌চেক।

"বাবার যদি পতন হয়ে থাকে তবে তোমায় বন্দুক এনে দেবেন কি করে ?" ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলে ওঠে লোইজকা।

"ওরা বাবাকে হত্যা করেছে···বাবার মৃত্যু হয়েছে ?"

"হ্যা। বাবার মৃত্যু হয়েছে।"

স্তব্ধভাবে ওরা তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে—ওদের ম্লান বিস্ফারিত চোখের বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টি যেন দূরে এক অনির্দেশ্য শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছে।

ঠিক ঐ সময় কুটীরের সামনে একখানি বেঞ্চির উপর বসে আছেন বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহী। বাগানের গাছপালার ভিতর দিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে চারিধারে। চতুর্দিকে এক গভীর স্তব্ধতা, শুধু একটানা একটা চাপা কান্নার সুর ভেসে আসছে ঘোড়াশাল থেকে। এ কান্না ঐ শিশুগুলির তরুণী

মায়ের--সম্ভবত সে এখন ঘোড়াগুলিকে খাবার দিতে গেছে ওখানে।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নতমুখে বসে আছেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে--গভীর আবেগে পরস্পরের হাত ধরে। উভয়েই নীরব। দিকচক্রবালের নীচে ধীরে ধীরে নেমে গেছে সূর্য--পশ্চিমের আকাশে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আলোকচ্ছটা। সেইদিকে নিবদ্ধ ওঁদের অশ্রুহীন নিষ্পলক দৃষ্টি।

প্রতিক্রিয়া

"বিবেক শব্দটা লোকে আব ব্যবহাব কবে না আজকাল," বললেন লাসিনা, "ওটাকে বলা হয অবদমন। কিন্তু বিবেক বলতে যা বোঝায় তাব তিন ভাগেব এক ভাগও প্রকাশ পায় না ঐ নতুন শব্দটিব মাধ্যমে। ফ্যাক্টবীব মালিক গিয়ের্ক-এব কথা তোমাদেব কাবো মনে আছে কিনা জানি না। গিয়ের্ক ছিল বেশ অর্থবান, আচাব-ব্যবহাবে অমায়িক আর দেখতেও সুপুরুষ। শোনা যেত গিয়ের্ক নাকি বিপত্নীক, কিন্তু ওব বেশী আব কিছুই লোকে জানত না তাব সম্বন্ধে। তাব স্বভাবটা ছিল চাপা। বযস যখন তাব চল্লিশ পেবিয়ে পঞ্চাশেব কাছাকাছি সেই সময় এক তরুণীব প্রেমে পড়ে সে। মেয়েটিব, বযস তখন মাত্র সতেবো আব তাব রূপেব জৌলুস ছিল এমনি যে তার দিকে একবাব তাকালে তোমাব বুকেব ভেতবটা মোচড দিয়ে উঠবে। সত্যিকাব সৌন্দর্য মানুষেব মনে এমন একটা বেদনা বা মমতাব অনুভূতি সৃষ্টি কবে যা ঠিক ভাষায প্রকাশ করা যায় না। এই মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে কবল গিয়ের্ক, যেহেতু অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে যাব, বিয়েব ব্যাপাবে তাব সাফল্য অনিবার্য।

মধুচন্দ্রিমা যাপন কবতে ওবা গেল ইতালীতে এবং সেখানে যা ঘটল তা এই : ভিনিসেব প্রসিদ্ধ কাম্পানিল পাহাড়েব নাম শুনেছ নিশ্চয়। একদিন বেড়াতে বেবিয়ে ওরা উঠল ঐ পাহাড়ে এবং সেখান থেকে গিয়ের্ক যখন তাকাল নীচেব দিকে—সবাই বলে ওখানকাব প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অত্যন্ত মনোবম—তখন তার মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে, তরুণী স্ত্রীব দিকে ফিবে হঠাৎ পড়ে গেল মাটিতে—মনে হল

কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে। গিয়ের্ক এমনিতেই ছিল গম্ভীর, এই ঘটনার পর সে আরো গম্ভীর হয়ে গেল। সে অবশ্য এমন একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করল যেন কিছুই হয়নি তার, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। এ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, তার স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনল বাড়িতে। পার্কের ধারে ওদের সুদৃশ্য বাড়ি—দামী আসবাবপত্রে সাজানো। আর ঐখানেই গিয়ের্ক-এর অদ্ভুত ব্যাধিটা দিনে দিনে জটিল হয়ে উঠল। বাড়ির প্রতিটি জানালা সে পরীক্ষা করে দেখত যথারীতি সেটা বন্ধ আছে কিনা এবং পরীক্ষা শেষ করে এসে বসতে না বসতেই আবার উঠে পড়ত চঞ্চলভাবে—জানালাগুলো পুনরায় দেখে আসার জন্য। এমন কি রাত্রেও বিছানা থেকে উঠে সারা বাড়ি নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াত প্রেতের মত। তার এই অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অস্পষ্টস্বরে সে শুধু বলত, তার মাথাটা দিবারাত্র ঘুরছে এবং তার ভয় হয় জানালাগুলো বন্ধ করা না হলে সে হয়তো জানালা দিয়ে পড়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সুতরাং জানালাগুলিতে লোহার গরাদে লাগাবার ব্যবস্থা করল তার স্ত্রী- যাতে ঐ অহেতুক ভয়টার হাত থেকে নিষ্কৃতি সে পায়। দিন কতক এ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। গিয়ের্ক-এর অস্থিরতা কমে গেল অনেকটা, মনে হল যেন সে সুস্থ হয়ে উঠছে। কিন্তু আবার রোগের লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল। আবার সে জানালায় জানালায় ঘোরাঘুরি শুরু করল। গরাদেগুলো নাড়া দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল ওগুলো মজবুত কিনা। এর পর ইস্পাতের খড়খড়ি এনে বসানো হল জানালায় এবং তার অন্তরালে ওরা দিন কাটাতে লাগল কয়েদীদের মত। এ অবস্থায় গিয়ের্ক অবশ্য একটু শান্তি লাভ করল, কিন্তু এখন আবার অন্যরকম উপসর্গ দেখা দিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় গিয়ের্ক-এর মাথা ঘুরতে লাগল। কাজেই যখন সে উপরে আসত বা নীচে নামত তখন কেউ তার হাতটা ধরত শক্ত করে যেমন ধরতে হয় পঙ্গুকে। কিন্তু হাত ধরা সত্ত্বেও সে কাঁপত থরথর করে এবং ঘামে তার সর্বাঙ্গ যেত ভিজে। মাঝে মাঝে

সে বসে পড়ত সিঁড়ির মাঝপথে এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করত—এমনি ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয়েছিল তার।

অবশ্য এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া হতে লাগল এবং এসব ব্যাপারে সচরাচর যা ঘটে, বিভিন্ন চিকিৎসক বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। একজন বললেন, মাথা ঘোরার কারণটা হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রম, আরেকজন বললেন, এটা একরকমের ব্যাধি, নাম ল্যাবিরিন্থাইটিস্, তৃতীয়জন বললেন, এটার উৎপত্তি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে এবং চতুর্থজনের ধারণা মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পতাই এর কারণ। আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই কেউ বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন তখনই এক অজ্ঞাত মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে তাঁর মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ঐ ধরনের একজন বিশেষজ্ঞ বলবেন, আমার মতে ব্যাপারটা হল এই রকম, আরেকজন আপত্তি তুলে বলবেন, না, ওটা ঠিক নয়, আমার মত হচ্ছে ঠিক উল্টো। আমি বলি কি, রোগী দেখার সময় ঐসব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রবেশদ্বারে ফেলে আসতে হবে টুপী আর ছড়ির মত। যখনই ঐ রকম দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা কোন বিশেষজ্ঞকে তুমি চিকিৎসার সুযোগ দেবে তখনই সে নির্ঘাত কোন অনিষ্ট করে বসবে, নয়তো প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে তার মতভেদ ঘটবে। কিন্তু ও-সব কথা যাক, গিয়েৰ্ক-এর কথায় এখন ফিরে আসি। প্রতি মাসেই একজন নতুন নাম-করা বিশেষজ্ঞ এসে গিয়ের্ক-এর চিকিৎসার ভার নিয়ে তার ওপর উৎপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী। গিয়ের্ক অবশ্য বেশ বলিষ্ঠ ছিল বলেই এই সব চিকিৎসার অত্যাচার সহ্য করতে পেরেছিল। কিন্তু শেষটা সে রোগে এমনি কাতর হয়ে পড়ল যে আর উঠতে পারত না চেয়ার থেকে, কারণ মাটির দিকে তাকালেই মাথাটা ঘুরত তার। কাজেই চুপচাপ বসে সে তাকিয়ে থাকত শূন্যের পানে—কেবল মাঝে মাঝে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠত থর থর করে আর ঐ কাঁপুনিটা আসত সে কাঁদত যখন।

এই অবস্থায় একজন নতুন চিকিৎসক—স্নায়ুবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী—তার চিকিৎসা শুরু করলেন। নাম তাঁর স্পিটস্। ডাক্তার

স্পিটস্ একেবারে ভেল্‌কি দেখিয়ে দিলেন। তাঁর চিকিৎসা প্রণালী ছিল মনোবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, প্রত্যেকেরই অবচেতন মনে নানা রকমের ভয়ঙ্কর চিন্তা, স্মৃতি বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যা সে প্রবল চেষ্টায় দমন করে রাখে, কারণ ঐগুলো সম্বন্ধে একটা নিদারুণ ভয় আছে তার। আর ঐ অবদমিত চিন্তা মানুষের মনের মধ্যে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, যা থেকে স্নায়বিক বিকার দেখা দেয়। যখন কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফলে ঐ নিরুদ্ধ স্মৃতি বা কামনাকে তার মনের গোপন কন্দর থেকে বাইরে টেনে আনেন তখন রোগীর যাতনার উপশম হয় এবং আরোগ্য লাভ করে সে। কিন্তু মনঃসমীক্ষার সাহায্যে যিনি চিকিৎসা করেন তাকে গোড়ায় রোগীর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যাতে রোগী সব কিছুই অকপটে ব্যক্ত করে তাঁর কাছে— রাত্রে সে কী স্বপ্ন দেখে, শৈশবের কী কী ঘটনা তার স্মরণে আছে ইত্যাদি। সব কিছু জানার পর চিকিৎসক রোগীকে বলবেন, "দেখুন, বহু বৎসর পূর্বে আপনার এই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল—ব্যাপারটা খুবই কলঙ্কজনক, আপনি সেটা ভুলে থাকতে চান, কিন্তু ভুলতে পারেন না —আপনার অবচেতন মনে আশ্রয় নিয়েছে সেটা। এটাকে আমরা বলি সাইকিক ট্রমা। কিন্তু এখন ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন আপনি, আপনার আর কোন ব্যাধি নেই —আপনি সুস্থ।" এই হল ঐ চিকিৎসার গূঢ় রহস্য।

সত্যিই ডাক্তার স্পিটস্-এর চিকিৎসা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। ধনী লোকদের যে কতরকমের অবদমিত স্মৃতি আছে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। গরীব লোকেরা সচরাচর এই সব যাতনা থেকে মুক্ত। ডাক্তার স্পিটস্-এর পসার ছিল খুব। সমস্ত বড় বড় চিকিৎসক গিয়ের্ক-এর চিকিৎসায় যখন বিফল হলেন তখন ডাকা হল ডাক্তার স্পিটস্‌কে। স্পিটস্ রোগী পরীক্ষা করেই বললেন, ঐ মাথাঘোরা ব্যাপারটা স্নায়ুঘটিত এবং ঐ ব্যাধি থেকে রোগীকে মুক্ত করার ক্ষমতা তিনি রাখেন। কিন্তু মুশকিল হল একটা

বিষয়ে। গিয়ের্ক কথা বলত খুব কম। ডাক্তার স্পিটস্ যে সব প্রশ্ন করতেন তার উত্তরে সামান্য দু'একটা কথা বলেই চুপ করে যেত গিয়ের্ক। শেষটা ডাক্তার স্পিটস্‌কে বিদায় নিতে বলত গিয়ের্ক— বিরক্তি চাপতে না পেরে। ডাক্তাব স্পিটস্ নিরাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করতে হলে এ ধরনের অদ্ভুত রোগীকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। স্নায়ুবিক বিকারের এরকম কেস বড় একটা হাতে আসে না। তাছাড়া ইর্মা অর্থাৎ গিয়ের্ক-এর হতভাগিনী সুন্দরী স্ত্রীব কথাটাও না ভেবে পারা যায় না। কাজেই ডাক্তাব স্পিটস্-এর পক্ষে কেস ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হল না, ববং আরো উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে মন দিলেন পর্যবেক্ষণেব কাজে।

"গিয়ের্ক-এর রোগের মূল—তাব অবদমিত স্মৃতিটা—আমি আবিষ্কার করবই," উত্তেজিতভাবে বলেন ডাক্তাব স্পিষ্টস্, "যদি না পাবি, চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে দর্জির দোকানে কাজ নেব আমি।"

এব পর স্পিটস্ মনোবিকলনেব এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে অগ্রসর হলেন। প্রথমটা তিনি গিয়ের্ক-এব বয়স্ক আত্মীয় ও আত্মীয়াদেব সন্ধান করলেন, তারপব তাদের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করলেন যাতে তারা সব কথাই তাঁর কাছে ব্যক্ত করে অকপটে। চিকিৎসককে গোড়াতেই যে বিষয়গুলি শিখতে হয় তাব মধ্যে একটি হচ্ছে অপরেব কথা ধীরভাবে শোনা—ধৈর্যই হল তাঁব প্রথম পাঠ। গিয়ের্ক-এর আত্মীয়স্বজন খুবই খুশি হলেন স্পিটস্-এব আচরণে। প্রত্যেকের কথাই তিনি শুনতেন বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পিটস্-এর আশা ফলবতী হল না এবং উপায়ান্তর না দেখে এক গোপন সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানেব শরণার্থী হলেন তিনি। তারা দুজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাল এক অজ্ঞাত স্থানে। ওরা যখন ফিরে এল, তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে স্পিটস্ সোজা চলে এলেন গিয়ের্ক-এর কাছে। গিয়ের্ক তখন একটি স্বল্পান্ধকার কক্ষে চুপ করে বসেছিল একটা চেয়ারে। এখন সে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, হাত-পা নাড়তেও যেন কষ্ট হয় তাব।

"মিঃ গিয়ের্ক," ডাক্তার স্পিটস্ বললেন কোমলকণ্ঠে "আপনাকে বিরক্ত করব না আমি। আমার কোন কথারই জবাব আপনাকে দিতে হবে না। কোনো বিষয়েই আপনাকে কোন প্রশ্ন করব না আমি। আমি যা করতে চাই তা হচ্ছে আপনার ঐ মাথা ঘোরার কারণটা দূর করা। আপনি এটাকে ঠেলে দিয়েছেন অবচেতনার মধ্যে, কিন্তু ঐ অবদমিত স্মৃতিটা এত প্রবল যে ওটা ঘোর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে..."

"আপনাকে আমি ডেকে পাঠাইনি, ডাক্তার," বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে গিয়ের্ক বলে এবং হাতটা বাড়ায় হ্যাণ্ডবেলের দিকে।

"তা আমি জানি," ধীরস্বরে জবাব দেন ডাক্তার স্পিটস্, "কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। প্রথম যখন ভিনিসে কাম্পানিল পাহাড়ের ওপর আপনার এই মাথাঘোরা শুরু হয় তখন আপনার মনের মধ্যে কী অনুভূতি জেগেছিল তা একবার স্মরণ করার চেষ্টা করুন।"

হ্যাণ্ডবেলের উপর আঙুলটা রেখে নিস্পন্দভাবে বসে থাকে গিয়ের্ক।

"আপনার মনে তখন একটা তীব্র অনুভূতি জেগেছিল," স্পিটস্ বলতে থাকেন ধীরকণ্ঠে, "হ্যাঁ, একটা ভয়ঙ্কর দুর্নিবার বাসনা জেগেছিল আপনার সুন্দরী স্ত্রীটিকে ঘণ্টাঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেবার জন্য। কিন্তু যেহেতু ওঁর প্রতি আপনার অনুরাগ ছিল প্রচণ্ড রকমের, সেজন্য একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় আপনার মনে এবং সেই দ্বন্দ্ব আপনাকে এত বিপর্যস্ত করে তোলে যে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান আপনি।"

গিয়ের্ক একেবারে স্তব্ধ। হ্যাণ্ডবেলের দিকে যে-হাতটা বাড়ানো ছিল সেটা টেবিলের ওপর নেতিয়ে পড়ে অবশভাবে।

"তার পর থেকেই," ডাক্তার স্পিটস্ বলে চলেন, "এই মাথা ঘোরাটা, অতলে পড়ে যাওয়ার এই ভয় আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেই থেকে জানালাগুলো আপনি বন্ধ করে রেখেছেন এবং উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে তাকানো আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে

উঠেছে যেহেতু একসময় আপনার মনের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছা জেগেছিল মিসেস্ গিয়ের্ককে ঠেলে নীচে ফেলে দেবার জন্য…"

গিয়ের্ক একটা আর্তনাদ করে ওঠে যা অত্যন্ত অস্বাভাবিক শোনায়।

"হ্যাঁ," ডাক্তার স্পিটস্ পুনরায় বলতে থাকেন, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে অস্বাভাবিক ভয় এটা এল কোথা থেকে? মিঃ গিয়ের্ক, আপনার প্রথম বিবাহ হয়েছিল আঠারো বছর আগে। আপনার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে আল্পস্ পর্বতাঞ্চলে ভ্রমণের সময়। হোহে ওয়াণ্ড-এর ওপর ওঠবার সময় তিনি হঠাৎ পড়ে যান নীচে খাদের মধ্যে এবং তাঁর সম্পত্তি আপনি পান উত্তরাধিকারী হিসেবে।"

গিয়ের্ক-এর দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। গিয়ের্ক যেন কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছে।

"গিয়ের্ক," গম্ভীরকণ্ঠে বলেন ডাক্তার স্পিটস্, "তোমার প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করেছিলে তুমি। তুমিই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে পাহাড় থেকে। আর সেই কারণেই—হ্যাঁ, আমি বলছি সেই কারণেই তোমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, দ্বিতীয়া স্ত্রীকেও তোমায় হত্যা করতে হবে—যার ওপর তোমার সত্যিকারের দরদ আছে। সেইজন্যই উঁচু জায়গায় উঠতে ভয় হয় তোমার—সেই-জন্যেই তোমার ঐ মাথাঘোরা…"

"ডাক্তার," কাতরকণ্ঠে বলে গিয়ের্ক, "ডাক্তার, আমি কী করবো এখন? কী করলে এই মাথাঘোরা বন্ধ হবে?"

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন ডাক্তার স্পিটস্।

"মিঃ গিয়ের্ক," স্পিটস্ বলেন, "আমি যদি ধর্মযাজক হতাম, তাহলে আপনাকে উপদেশ দিতাম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাতে ভগবান আপনার ওপর করুণা করেন। কিন্তু আমরা—ডাক্তাররা—ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। এখন আপনার কী করা কর্তব্য সেটা আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু ডাক্তারী মতে আপনি যে মুক্তি লাভ করেছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। উঠে দাঁড়ান, মিঃ গিয়ের্ক।"

গিয়ের্ক উঠে দাঁড়ায়—মুখখানা কাগজের মত সাদা।

"বলুন দেখি, এবার আপনার মাথা ঘুরছে কিনা?" স্পিটস্ জিজ্ঞাসা করেন শান্তস্বরে।

"না," গিয়ের্ক জবাব দেয় মাথা নেড়ে।

"এখন তাহলে আপনি রোগমুক্ত," স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন স্পিটস্, "অন্য সব উপসর্গও শীঘ্রই চলে যাবে। ঐ মাথা ঘোরাটা ছিল অবদমনের ফল। এখন ও থেকে মুক্ত হয়েছেন যখন, তখন শীঘ্রই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। জানালা দিয়ে এখন বাইরে তাকাতে পারবেন কি? মাথা ঘুরছে না তো? বেশ, তাহলে আর কোন ভয় নেই। এখন আপনার মনে হচ্ছে যেন রোগটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন, কেমন? এতটুকুও মাথাঘোরা নেই? মিঃ গিয়ের্ক আজ পর্যন্ত যত কেস্ পেয়েছি তার মধ্যে আপনারটাই হচ্ছে সব চেয়ে চমৎকার!" আনন্দে ডাক্তার স্পিটস্ হাত দুখানা যুক্ত করে ঘষতে থাকেন।

"এখন আপনি সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত। আমি কি মিসেস গিয়ের্ককে ডেকে পাঠাতে পারি? না? ও, বুঝেছি, আপনি নিজেই ওকে অবাক করে দিতে চান। আপনাকে চলাফেরা করতে দেখলে কী খুশিই না হবেন উনি! বিজ্ঞান কী আশ্চর্য ব্যাপার ঘটাতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন, গিয়ের্ক।"

নিজের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে ডাক্তার স্পিটস্ হয়তো ঘণ্টা দুই এইরকম বকে যেতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল গিয়ের্ক-এর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই ব্রোমাইড্-এর ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন তিনি।

"চলুন, ডাক্তার, আপনাকে আমি" দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, গিয়ের্ক বলে নম্রভাবে এবং সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় ডাক্তারের সঙ্গে।

"খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, মাথাঘোরার কোন লক্ষণই আর নেই," ডাক্তার স্পিটস্ বলেন উচ্ছ্বসিতভাবে, "আমার চেষ্টা তাহলে সার্থক হয়েছে। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তো?"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ," মৃদুস্বরে বলে গিয়ের্ক এবং ডাক্তার যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকেন, ধীরভাবে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। সদর দরজা যখন সশব্দে বন্ধ হল ঠিক সেই সময় কী একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শোনা গেল।

কিছুক্ষণ পরে গিয়ের্ক-এর দেহ দেখতে পাওয়া গেল সিঁড়ির নীচে। তার দেহে তখন প্রাণ নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কয়েক স্থানে থেঁতলে গেছে সিঁড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে।

ডাক্তার স্পিটস্‌কে যখন খবরটা দেওয়া হল, তিনি আপন মনে শিস দিয়ে মুখটা বিকৃত করলেন। তারপর একখানা মোটা খাতা বের করলেন যার মধ্যে রোগীদের নাম লেখা হত এবং গিয়ের্ক-এর নামের পাশে তার মৃত্যুর তারিখটা লিখে একটি শব্দ যুক্ত করে দিলেন —'সুইসাইডম'। ওর মানে কী তা তুমি অনায়াসেই অনুমান করতে পারো, মিঃ তাউসিগ।"

শেষ জয়

পল দ্য মুসে (১৮০৪-১৮৮০) উনবিংশ শতকের শক্তিশালী ফরাসী সাহিত্যিকদের অন্যতম। এঁর রচনা ফরাসী কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছে। এঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস আজও রসিক পাঠকসমাজে সমাদৃত। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলফ্রেদ দ্য মুসে-ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত।

যখন সে ছিল সুদর্শন যুবক, যখন তার আবির্ভাবে তরুণী সমাজে অপরিমেয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত, তখন তাকে জানবার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। তাকে আমরা হিংসা করতাম শুধু তার দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, তার ব্যক্তিত্বের মাধুর্যের জন্য। যে-সব মেয়ে তার প্রেমে পড়ত তারা কেউ তাকে ভুলতে পারত না জীবনে—কিন্তু সে কখনো কোন মেয়েকে বেশিদিন ভালবাসতে পারত না। তার হৃদয়টা ছিল ডন জুয়ানের মতো—নিত্য নতুন শিকারের সন্ধানে তাকে ঘুরতে দেখা যেত।

তার মা তাকে অনেক বোঝাতেন তার জীবনের গতি ফেরাবার জন্যে, কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই হত নিষ্ফল। মেয়েদের অন্তর জয় করতে রেনে-র দক্ষতা ছিল অসাধারণ—কয়েক ঘণ্টার আলাপে সে তাদের এমনি মুগ্ধ করে দিত যে তার সাহচর্য তারা মনে মনে কামনা না করে পারত না। তার এই সাফল্য মায়ের মনে গর্বের সঞ্চার করলেও মনে মনে তিনি শঙ্কিত হতেন এর পরিণাম চিন্তা ক'রে। কত দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে সে জড়িত হয়েছে তা বলা যায় না, কিন্তু ভাগ্য তার অত্যন্ত সুপ্রসন্ন বলেই প্রতিবারই সে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে।

যে সময়কার কথা আমরা বলছি তখন সে একজন নামজাদা

অভিনেত্রী জার্ম্যা বি-র সঙ্গে বসবাস করছে। অভিনেত্রীটি তাকে ভালবাসত গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে, কিন্তু তার সে প্রাণঢালা ভালবাসা রেনে-কে ধরে রাখতে পারল না। তার কাতর মিনতি ও চোখের জলকে উপেক্ষা করে রেনে আর একজন সুন্দরী—মাদাম ইউ-র সঙ্গে প্রণয়লীলা শুরু করল। তারা দুজনে সবসময় একত্রে চলাফেরা করত এবং থিয়েটারে তাদের দেখা যেত প্রায়ই।

পরিত্যক্তা অভিনেত্রীর বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। রেনে-র হৃদয়হীনতা সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না। একদিন যখন রেনে দ্য ভারেনেস তার নতুন প্রণয়িনীর সঙ্গে অভিনয় দেখে বাড়ি ফিরছিল সেইসময় একটি মেয়ে হঠাৎ তার দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটিকে চেনবার আগেই কী একটা তরল পদার্থ রেনে-র মুখে এসে পড়ল আর সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে বসে পড়ল রাস্তার উপর। আশপাশে যারা ছিল তারা ছুটে এল তার চীৎকার শুনে, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জার্ম্যা প্রণয়ীর অবহেলার প্রতিশোধ নিল—এ সব ক্ষেত্রে মেয়েরা সচরাচর যে ভীষণ অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে, সে-ও তাই করেছে—রেনে-র মুখে সে নিক্ষেপ করেছে উগ্র ভিট্রিয়ল।

* * *

শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সাহায্য নেওয়া হল, কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলেন না। এ্যাসিড তার অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে। সুদর্শন রেনে-র মুখাবয়ব যে শুধু বিকৃত হল তা নয়, তার চোখদুটিও নষ্ট হয়ে গেল চিরদিনের মত।

ক্ষত আরাম হতেও অনেক দিন লাগল। মুখের উপর হাত বুলিয়ে সে ক্ষতস্থানগুলি পরীক্ষা করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশ্রী ক্ষত—কপালে, নাকে, গালে কোথাও বাদ নেই—কোনকালে যে তার দাগ নিঃশেষে মুছে যাবে তা মনে হয় না। তার বন্ধু-বান্ধব, বিশেষ করে তার মা, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে তার মুখ মোটেই বিকৃত হয়নি, শুধু সামান্য দু'একটা দাগ চোখে পড়ে।

"তুমি ও কথা বলছ যেহেতু তুমি আমার মা, তোমার কাছে চিরদিনই আমি একরকম," রেনে বিমর্ষমুখে বলে,—"কিন্তু তোমার কথা বিশ্বাস করবার আগে আমি অন্য কোন মেয়ের মুখে এ কথাটার সমর্থন চাই।"

"রেনে !"

'আমায় ক্ষমা করো, মা!···আমি জানি তুমিই শুধু আমায় সত্যিকার ভালবাসো। আর সব ভালবাসা আমি হারিয়েছি, তোমার ভালবাসাই এখন হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।"

কিন্তু মায়ের ভালবাসা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারল না এবং তার মা-ও তা বুঝতে পারলেন।

শান্তিতে দিন কাটাবে বলে তারা শহর ছেড়ে চলে গেল এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। সেখানে রেনে বাড়িব সংলগ্ন বাগানে বেড়াত, কোনদিন বা নিকটবর্তী পুকুরের পাড়ে বসে মাছ ধরত। সন্ধ্যার দিকে মা বই পড়ে শোনাতেন—ছেলেকে খুশি করবার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তবু তিনি লক্ষ্য করতেন রেনে যেন দিন দিন আরো বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে—যার উৎসাহদীপ্ত সুন্দর চেহারা দেখে একসময় তিনি মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন আজ সে জড়পিণ্ডের মতো নির্জীব উৎসাহহীন —যেন সে মৃত্যুর অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণছে !

রেনে-র মা একটি তরুণী মেয়েকে সঙ্গে এনেছিলেন নিঃসঙ্গতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। রেনে ঐ মেয়েটির কাছে যেতে ভরসা পেত না—তার আনন্দোচ্ছল তরুণ কণ্ঠস্বর তার অন্তরে বেদনার সৃষ্টি করত। নারী সে এবং নারীমাত্রেই যে এখন তাকে দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠবে এ বিষয়ে তার সংশয় ছিল না। যতদূর সম্ভব রেনে মেয়েটিকে এড়িয়ে চলত।

তবু বাড়িতে একটি অজানা তরুণী রয়েছে এ চিন্তা মাঝে মাঝে তার বৈচিত্র্যপিয়াসী বুভুক্ষু মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। একদিন সে কৃত্রিম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা করল," মেয়েটির নামটি কী মা ?"

"ওর নাম মারথ," মা জবাব দিলেন, "বয়স বাইশ তেইশ হবে, কোঁকড়ান সোনালি চুল আর···গোলাপি আভা ওর গালে, হাসলে ভারী সুন্দর টোল পড়ে।"

*   *   *

একদিন সন্ধ্যায় বাগানে একখানি বেঞ্চের উপর বসে সে বিশ্রাম করছিল এমন সময় হঠাৎ কার পায়ের শব্দ তার কানে এল। অলস লঘু পদক্ষেপ···নিশ্চয় মারথ্‌ই আসছে এইদিকে। তখন আর উঠে পালাবার সময় নেই। রেনে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।

রেনেকে লক্ষ্য করে মেয়েটি অপ্রতিভভাবে থামল। রেনে ভাবল, এখনই ও নিঃশব্দে প্রস্থান করবে, কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ ভীরুকণ্ঠে বলে উঠল, "আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম বলে ভারী দুঃখিত··· এখানে যে কেউ আছে তা আমি জানতামই না······"

"আপনি লজ্জিত হচ্ছেন কেন ? দোষ তো আমারই," দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে রেনে বলল—"এখানে বসে থেকে আপনার সান্ধ্য ভ্রমণটুকু নষ্ট করে আমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছি। তাছাড়া আমি তো বাড়ির ভেতর যাবো বলে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।"

কথাটা বলেই রেনে উঠে দাঁড়াল—কিন্তু এক পা অগ্রসর হয়েই মারথ্‌-এর এক অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সে থমকে দাঁড়াল।

"আপনি এখানে বসে থাকলে আমার সান্ধ্য ভ্রমণ নষ্ট হবে কেন ?"

কথাটা সে বলল বেশ আবেগের সঙ্গে আর বলা শেষ করেই সে যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

"ভান করা আমি পছন্দ করিনে বলেই ওকথা বললাম। কুশ্রী কদাকার পুরুষকে দেখে সব তরুণীই বিরক্তি বোধ করে।"

"সামান্য দু'একটা দাগ মুখে থাকলে পুরুষ কিছু কুৎসিত হয় না," মেয়েটি শান্তস্বরে বলল।

"আমি যদি চোখের ওপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা খুলে নিই তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে সরে যাবেন।"

"সেদিন আপনাকে আমি দেখেছি ব্যাণ্ডেজ খোলা অবস্থায়।

আপনি ড্রইংরুমের ভেতর দিয়ে ওধারের ঘরে যাচ্ছিলেন, আমি ছিলাম ঘরের এক কোণে বসে, আপনি আমায় দেখতে পান নি।"

"আর তাই...তুমি যা দেখেছ তাতে আমার দুর্দশার পরিমাণ উপলব্ধি করে তুমি...তুমি আজ এসেছ আমায় তোমার দয়া জানাতে!"

"না, এ দয়া নয়..." মেয়েটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

পরক্ষণেই সে ক্ষিপ্রপদে সেখান থেকে প্রস্থান করল।

সেদিন থেকে রেনে প্রায়ই বাগানে এসে বসত আর মাঝে মাঝে সেখানে দেখা হত মারথ্-এর সঙ্গে। দুচার দিন পরে তাদের দুজনের মধ্যে বেশ একটু অন্তরঙ্গতা দেখা গেল। রেনে-র অন্তরে জয়ের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠল। নারীর হৃদয় জয় করার চেষ্টা না করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা তার পক্ষে যেমন কষ্টকর তেমনি অর্থহীন।

মা রেনে-র পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। রেনে এখন সকল সময় প্রফুল্ল—জীবনের দীপ্তি ও উৎসাহ যেন ফিরে এসেছে।

মারথ্ রেনে-র প্রণয়ানুরক্তা।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা দুজন গোপনে বাগানে এসে বসত। নিভৃতে বসে তারা প্রেমালাপ করত—হাসি গল্পে রাত যেত বেড়ে, সেদিকে কারুর খেয়াল থাকত না। মারথ্-কে রেনে সত্যিই ভালবেসেছিল—এ ভালবাসা তার পূর্বেকার ভালবাসার মতো অসার অন্তঃসারশূন্য নয়, এ ভালবাসা তার বেদনার্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় পরিশুদ্ধ। রেনে-র ভালবাসা দিন দিন গভীর হতে লাগল এবং কিছুদিন পর সে স্থির করল মারথ্‌কে বিবাহ করার জন্য মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করবে।

একদিন সন্ধ্যায় রেনে মারথ্-এর অপেক্ষায় ঘরে বসেছিল, কিন্তু মারথ্-এর দেখা নেই। অনেকক্ষণ বসে বসে যখন সে অধীর হয়ে উঠল তখন আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল মারথ্‌কে সন্ধান করবার জন্য।

নীচে নেমে আসতেই কিসের কোলাহল তার কানে এসে পৌঁছল। কৌতূহলের বশে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।...তার মা ও মারথ্ ঝগড়া করছে ভীষণভাবে। মারথ্ তার মার সঙ্গে সচরাচর যেরকম সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইত তার লেশমাত্রও তার কণ্ঠস্বরে নেই— মনে হল সে যেন তার মাকে শাসাচ্ছে আর তার মা তাকে মিনতি করছেন করুণ সুরে।

"আর একটি মাস আমাদের সময় দাও," তাঁর মা বলছেন, "ওকে তৈরী করবার সময়টুকু তুমি দেবে নিশ্চয়...হঠাৎ ওর কাছে নিষ্ঠুর সত্যটা প্রকাশ করলে ও হয়তো পাগল হয়ে যাবে। তুমি টাকা চাও? বল, যা চাইবে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

"না, যত টাকাই আপনি দিন না কেন, আমি আর একদিনও এখানে থাকব না। আমি সাধারণ বারনারী বটে, কিন্তু এ দুর্ভোগ আমার অসহ্য। ওর বীভৎস চুম্বন আমি অনেক সহ্য করেছি...প্রতি রাত্রেই..."

"ভগবানের দোহাই, চুপ করো। ও কাজ করবার জন্যে তোমায় যে আমি অর্থ দিয়েছি—তোমার মতো স্ত্রীলোককে আমি যে ঘরে আশ্রয় দিয়েছি, সে শুধু আমার ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য—পাছে ও নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করে বসে। আমাদের দুজনকে দয়া করো...আমরা একান্ত বিপন্ন, নিঃসহায়..."

"আমি ওর মুখের পানে তাকাতে পারিনা—আমার কেমন ভয় করে।"

"আর কিছুদিন সবুর করো। আমার এই সুন্দর ব্রুচটা তোমায় উপহার দেবো...এগুলো আসল হীরা..."

মিনিট কয়েক পরে মারথ্ তার প্রণয়ীর ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেল। ঘরখানা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত।

"আমার বড় দেরি হয়ে গেছে...তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করছ?" ভীতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল।

সাড়া না পেয়ে অন্ধকারেই সে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু ঘরের মাঝখানে কার দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।

মারথ্-এর চীৎকারে রেনে-র মা বাতি হাতে ছুটে এলেন ঘরের মধ্যে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তারা এক ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল।

রেনে-র মৃতদেহ মেঝের ওপর পড়ে আছে, গলায় ও কাঁধে ক্ষুরের গভীর দাগ আর সেখান থেকে রক্ত ছুটছে ফিন্‌কি দিয়ে।

শোকাতুর মা যখন পুত্রের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে আর্তনাদ করছেন তখন মারথ্—রেনে-র প্রণয়িনী আয়নার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল—তার সমস্ত পোশাক রক্তে লাল হয়ে গেছে।

নেকড়ের ডাক

"তোমাদের এই দুর্গ সম্বন্ধে কোন প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে কি?" ভগ্নীকে লক্ষ্য ক'রে উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে প্রশ্ন করে কনরাড। হামবুর্গের একজন কৃতী ব্যবসায়ী কনরাড, কিন্তু ব্যবসায়ী হলেও তার মধ্যে আছে এক কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা যা তাদের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন পরিবারে একান্ত বিরল।

কনরাডের প্রশ্নে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে মুখটা বিকৃত করেন স্থূলদেহা ব্যারনেস গ্রুয়েবল। তারপর একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন, "এই সব প্রাচীন অট্টালিকা সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনতে পাবে লোকের মুখে। এগুলো রচনা করতে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয় না আর এতে অর্থব্যয়ও হয় না কা'রো। এই দুর্গ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে যে, যখনই এখানে কারো মৃত্যু হয় তখনই গাঁয়ের সমস্ত কুকুর এবং জঙ্গলের যত সব বন্য পশু সারারাত চীৎকার করে। সে চীৎকার যে কানে মধু বর্ষণ করে না একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।"

"কিন্তু ঐ চীৎকারে যে অলৌকিক রহস্যময়তা রয়েছে তার একটা আকর্ষণ আছে বৈকি," প্রতিবাদের সুরে বলে কনরাড।

"সে যাই হোক, ঐ কিম্বদন্তীর মধ্যে সত্যতা নেই এতটুকু," শান্তস্বরে বলেন ব্যারনেস, "এই দুর্গ কেনার পর আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ঐ সমস্ত কিছুই ঘটে না। গত বছর বসন্তকালে যখন আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী মারা যান তখন আমরা ঐ আওয়াজ শোনবার জন্য কান খাড়া ক'রে ছিলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে পাইনি। ওটা নিছক কাহিনী, প্রাচীন দুর্গটির শুধু গৌরব বৃদ্ধি করেছে।"

"কাহিনীটি আপনি যেভাবে বর্ণনা করলেন ঠিক তেমনটি নয়, মন্তব্য করেন বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী আমালি।

সকলে তাঁর দিকে তাকায় বিস্ময়ের সঙ্গে। আমালি বরাবরই চুপ করে বসে থাকেন টেবিলের এক ধারে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলেন না তিনি—তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহও দেখা যায় না কা'রো। আজ হঠাৎ যেন এক প্রগল্‌ভতা পেয়ে বসেছে তাঁকে। ঈষৎ উত্তেজিতভাবে তিনি কথা বলতে থাকেন—দ্রুত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি শূন্যের দিকে নিবদ্ধ।

"এই দুর্গে যে কেউ মারা গেলে ঐ চীৎকার শোনা যাবে এ ধারণা করা ভুল। সারনোগ্রাৎস্ পরিবারের কেউ যদি এখানে মারা যায় তবেই দূর দূরান্তর থেকে নেকড়ের দল এসে মৃত্যুর ঠিক পূর্বে চীৎকার শুরু করে জঙ্গলের ধারে। এখানকার জঙ্গলে মাত্র কয়েকটি নেকড়ের বাসা আছে, কিন্তু জঙ্গলের রক্ষকেরা বলে যে ঐ সময় চতুর্দিক থেকে দলে দলে নেকড়ে এসে হাজির হয় জঙ্গলে এবং একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে। আর দুর্গে ও [illegible] যত কুকুর আছে, নেকড়ের ডাক শুনে তারাও চীৎকার শুরু করে দেয় ভয় ও রাগে। মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মা যেই তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায় অমনি পার্কে একটা গাছ ভেঙে পড়ে মড় মড় করে। সারনোগ্রাৎস্ বংশের কেউ তাদের এই পারিবারিক বাসভবনে মারা গেলে এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার ঘটে, কিন্তু অপর কেউ যদি এখানে মারা যায় তাহলে নেকড়ের ডাকও কেউ শুনতে পাবে না, গাছও ভেঙে পড়বে না পার্কে। না, ঐ সমস্ত কিছুই ঘটবে না।"

শেষের কথা কয়টি বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে যুগপৎ গর্ব ও ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে। বার্ধক্যপীড়িতা শীর্ণদেহা শিক্ষয়িত্রীর পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান বিলাসিনী ধনগর্বিতা ব্যারনপত্নী। বৃদ্ধার স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হন তিনি।

"সারনোগ্রাৎস্ পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছুই তুমি জানো দেখছি, ফ্রাউলিন শ্‌মিড," বিদ্রূপের সুরে বলেন ব্যারনেস, "আমি জানতাম

না যে ঐ সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য আছে তোমার।”

ব্যারনপত্নীর এই ব্যঙ্গোক্তির জবাবে বৃদ্ধা যা বললেন তা একান্ত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর।

“আমি সারনোগ্রাৎস্ বংশের মেয়ে—সেইজন্যই ও বংশের ইতিহাস সবই আমার জানা,” শান্তকণ্ঠে বলেন বৃদ্ধা।

“অ্যা! সারনোগ্রাৎস্ বংশের মেয়ে তুমি! তুমি!” সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে অবিশ্বাসের সুরে।

“আমরা যখন অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়লাম,” ধীরকণ্ঠে বৃদ্ধা বলতে থাকেন, “এবং জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হল আমায়, তখন অন্য নাম গ্রহণ করলাম আমি। ভাবলাম, আসল নাম গোপন ক'রে অন্য নাম নেওয়াই উচিত হবে আমার পক্ষে। আমার পিতামহ দীর্ঘকাল এই দুর্গে অতিবাহিত করেছিলেন এবং পিতার মুখে এই দুর্গ সম্বন্ধে অনেক গল্পই আমি শুনেছি। মানুষের জীবনে স্মৃতি ছাড়া যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন সেই স্মৃতিটুকুই সে সযত্নে লালন করে অন্তরের মধ্যে। আপনাদের পরিবারে কাজ নেবার সময় আমি ভাবতেই পারিনি যে একদিন আপনাদের সঙ্গে আমায় আসতে হবে আমাদেরই পরিবারের প্রাচীন আবাসে। এখানে যদি না আসতে হত তাহলে বোধ করি মনে মনে খুশিই হতাম আমি।”

বৃদ্ধার কথা শেষ হবার পর সকলে চুপ করে থাকে। পারিবারিক ইতিহাসের আলোচনা ত্যাগ ক'রে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ব্যারনপত্নী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে শিক্ষয়িত্রী নিঃশব্দে অন্যত্র চলে যাবার পর আবার একটা ঘৃণা ও অবিশ্বাসের প্রবল কলরব ওঠে।

“এ নিতান্ত ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়,” বেশ একটু উষ্মার সঙ্গে মন্তব্য করেন ব্যারন, “আমাদের সামনে ঐ ধরনের কথা বলবে সামান্য একজন স্ত্রীলোক এ আমি ভাবতেই পারি না। ও যেন বলতে চায় আমরা অতি তুচ্ছ, সামাজিক পদমর্যাদা আমাদের কিছুই নেই। ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি। ও কখনোই সারনোগ্রাৎস্

বংশের মেয়ে নয়—ও সত্যই শ্‌মিড—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। নিশ্চয়ই ও স্থানীয় কৃষকদের মুখে প্রাচীন সারনোগ্রাৎস্‌ পরিবারের কাহিনী শুনেছে আর এখানে সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ক'রে নিজেকে ঐ পরিবারের মেয়ে বলে দম্ভ করে গেল।"

"ও যে অভিজাত পরিবারের মেয়ে এই কথাটা জানানো ওর উদ্দেশ্য," গম্ভীরমুখে বলেন ব্যারনেস, "ও যে আর বেশীদিন কাজ করতে পারবে না তা ও জানে, তাই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ওর পিতামহ নাকি এই দুর্গে বাস করতেন। সত্য হলেও এ কথা আবার কেউ বলে নাকি? আমারও তো পিতামহ ছিলেন, কিন্তু কই, তাঁর ঐশ্বর্যের কথা তুলে কোনদিন গর্ব করিনি আমি।"

"আমাব মনে হয় ওব পিতামহ এই দুর্গে পাকশালার ভৃত্য ছিল," বিদ্রূপের সুরে বলেন ব্যারন, "ওর গল্পের এই অংশটুকু হয়তো সত্য।"

কনরাড চুপ কবে থাকে, কোনো মন্তব্য করে না। বৃদ্ধা যখন অতীতের স্মৃতিকে [illegible]র লালন করার কথা বলছিলেন তখন তাঁর চোখে অশ্রু দেখেছিল সে। হয়তো বা কল্পনাপ্রবণ বলে সে শুধু অনুমান করেছিল বৃদ্ধার চোখে অশ্রু টলটল করছে।

"নববর্ষের উৎসব শেষ হলেই আমি ওকে জানিয়ে দেবো ওকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই," ব্যারনেস বলেন বিরক্তির সুরে, "এখনই ওকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হবে না, কারণ উৎসবের সময় একা সব কাজ তদারক করা কষ্টকর হবে আমার পক্ষে।"

কিন্তু কষ্টকর হলেও একাই তাঁকে উৎসবের সময় সব কিছু তদারক করতে হল, কারণ ক্রিষ্টমাসের পর এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল যে বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী [illegible]স্থ হয়ে পড়লেন এবং ঘরের বাইরে আসার সামর্থ্য রইল না তাঁর।

নববর্ষ উৎসবের পূর্বে, একদিন সন্ধ্যায় অতিথিরা যখন অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে আরাম উপভোগ করছেন সেই সময় ব্যারনেস হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

"কী বিরক্তিকর ব্যাপার বলুন দেখি!" ব্যারনেস বলেন অতিথিদের লক্ষ্য ক'রে, "ফ্রাউলিন এখানে আসা অবধি একদিনও ওকে অসুস্থ হতে দেখিনি আর আজ ও এমনি অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে কোন কাজ করবার সামর্থ্যই ওর নেই'। বাড়ি এখন অতিথিতে ভরে গেছে, নানাভাবে ও আমায় সাহায্য করতে পারত, কিন্তু এই সময়ে ও কিনা অসুখ বাধিয়ে বসল। অবশ্য বেচারীর জন্য দুঃখ হয় আমার, ভারী দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমিই বা একা সামলাবো কি করে? এ যে কী বিরক্তিকর তা বলতে পারি না।"

"সত্যিই এ অত্যন্ত বিরক্তিকর," সহানুভূতির সুরে বলেন ব্যাঙ্কারের স্ত্রী, "আমার মনে হয় ঠাণ্ডার দরুন বৃদ্ধা কাবু হয়ে পড়েছে। এ বছর শীতটা পড়েছে প্রচণ্ড রকমের।"

"ওর বয়সটাও তো কম নয়—এই বয়সে এরকম ঠাণ্ডা ও সহ্য করবে কেমন করে? কয়েক সপ্তাহ আগেই ওকে বিদায় দিলে ভাল করতাম--অসুখ হবার আগেই তাহলে ও চলে যেত এখান থেকে।... ওয়াপ্পি, কী হল রে তোর? হঠাৎ এমন ক[illegible]স কেন?"

লোমে ঢাকা ছোট্ট কুকুরটা হঠাৎ চেয়ারের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে সোফার নীচে আশ্রয় নেয় অত্যন্ত ভয়ার্তের মত। ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্গ-প্রাঙ্গণ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডেকে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে দূর পল্লী থেকেও অন্যান্য কুকুরের ডাক ভেসে আসে।

"কুকুরগুলো হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল কেন?" জিজ্ঞাসা করেন ব্যারন।

উপস্থিত সকলে কান খাড়া করতেই শুনতে পায়, বিলাপের সুরে একটানা একটা তীক্ষ্ণ গর্জন বাতাসে ভেসে আসছে। ঐ গর্জন শুনেই ভীত ও ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরগুলো চীৎকার শুরু করেছিল। আওয়াজটা কখনও স্পষ্ট, কখনও মৃদু—কখনও মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে আসছে পাহাড় প্রান্তর পেরিয়ে, কখনও বা মনে হচ্ছে অতি নিকট থেকে— যেন দুর্গপ্রাচীরের তলদেশে গর্জন করছে কান্না। শীতার্ত বনভূমির

যাবতীয় দুঃখক্লেশ, ক্ষুধিত বন্য পশুর অসহায় কাতরতা, রিক্ত প্রকৃতির যা কিছু মর্মবেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐ বেদনার্ত বিলাপের মধ্যে।

"নেকড়ে বাঘ! নেকড়ে বাঘের ডাক।" চেঁচিয়ে ওঠেন ব্যারন! সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে বাঘের ঐকতান প্রচণ্ড আবেগে ফেটে পড়ে যেন। চতুর্দিক থেকে একটানা ঐ ভয়ার্ত বিলাপ দুর্গপ্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

"হ্যাঁ, নেকড়ের ডাকই বটে। শত শত নেকড়ে একসঙ্গে ডাকতে শুরু করেছে।"—উচ্ছ্বসিত আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে কনরাড। কল্পনার আবেশে চোখদুটো তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হঠাৎ ব্যারনেস উঠে দাঁড়ান চঞ্চলভাবে। ভুলে যান অতিথিদের আপ্যায়নের কথা। ব্যস্তভাবে এগিয়ে যান বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের দিকে। শীতের রাতেও জানলাটা খোলা রয়েছে। সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃদ্ধা শুয়ে আছেন তাঁর রোগশয্যায়। খোলা জানলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ব্যারনেস শশব্যস্তে এগিয়ে আসেন জানলাটা বন্ধ করতে।

"বন্ধ ক'রো না—জানলা খোলাই থাক," বৃদ্ধা বলেন গম্ভীরভাবে। কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা সত্ত্বেও এমন একটা আদেশের সুর ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে যা ব্যারনেসের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব।

"কিন্তু ঠাণ্ডায় তুমি যে মারা পড়বে।" প্রতিবাদ করেন ব্যারনেস।

"মৃত্যু কেউ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না," ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন বৃদ্ধা, "আমি ওদের সঙ্গীত শুনতে চাই। দূর দূরান্তর থেকে ওরা এসেছে আমাদের পরিবারের মৃত্যু-সঙ্গীত গাইবার জন্য। ওরা যে এসেছে এতে আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। আমিই সারনোগ্রাৎস্ পরিবারের শেষ প্রতিনিধি যে আমাদের এই প্রাচীন দুর্গে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। ওরা এসেছে আমাকে ওদের সঙ্গীত শোনাতে। শোনো, ঐ ওরা ডাকছে। কী মধুর, আবেগময় ওদের ডাক!"

শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে নেকড়েদের চীৎকার ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং দুর্গপ্রাচীরের চারিদিকে ভাসতে থাকে মর্মভেদী

করুণ বিলাপের সুর। বৃদ্ধা সে চীৎকার শুনতে থাকেন তন্ময় হয়ে—তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

"চলে যাও এখান থেকে।" ব্যারনেসকে লক্ষ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি এখন আর নিঃসঙ্গ নই। এক প্রাচীন অভিজাত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আমি···আমাদের পরিবারের অনেকেই এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে···তারা সবাই রয়েছে আমার চারপাশে···"

"আমার মনে হয় বৃদ্ধার শেষ সময় উপস্থিত," অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হবার পর বিষণ্নমুখে বলেন ব্যারনেস, "এখনই একজন চিকিৎসককে আনা দরকার।···ওঃ, ঐ ভয়ঙ্কর চীৎকারে দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে। প্রচুর অর্থের বিনিময়েও ওরকম মৃত্যু-সঙ্গীত কামনা করি না আমি।"

"অর্থের বিনিময়ে ঐ সঙ্গীত পাওয়া যায় না," আবেগপূর্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করে কনরাড।

"ওটা আবার কিসের শব্দ?" চমকে উঠে প্রশ্ন করেন ব্যারন।

দুর্গসংলগ্ন পার্কে মড় মড় শব্দে একটা প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে পড়ে।

এক মুহূর্ত সকলে নির্বাক হয়ে থাকে—যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তারা। তারপর ব্যাঙ্কারের স্ত্রী যেন কতকটা আত্মস্থ হয়ে বলেন, "প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুনই গাছ ভেঙে পড়ছে। ঠাণ্ডার দাপটেই নেকড়ে বাঘের দল গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এমন ভয়ঙ্কর শীত অনেককাল আমরা দেখিনি।"

শীতের প্রকোপই যে ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যারনেস তা মেনে নেন আগ্রহের সঙ্গে। বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণও নিশ্চয়ই শীতের আধিক্য। খোলা জানলা দিয়ে হিম এসেই বেচারীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল তাতে দেখা গেল গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি:

২৯শে ডিসেম্বর শ্লস্ সারনোগ্রাৎস্ দুর্গে আমালি ফন সারনেগ্রাৎস্ দেহত্যাগ করেছেন। দীর্ঘকাল তিনি ব্যারন ও ব্যারনেস গ্রুয়েবল-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।